Anweshan

July 2021
Volume 2, Issue3

In Quest of Dimension

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

Service to Atman is Service to Param Atman

स उ प्राणस्य प्राणः

ANWESHAN

MOUTHPIECE OF RYKYM

Digital Edition Release Date: 24th July 2021

Volume – 2: Issue - 3

Publisher:

RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION
401, S. R. K, Paramhangsa Apartment.
6, Dargah Tala Ghat Lane. Post, Bhadrakali
Uttar Para, West Bengal 712232

Copyright © RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION

Website: www.rykym.org

সংঘ মাতা - Sangh Mata:
শ্রীমতী সুজাতা রায় (Srimati Sujata Ray)

সম্পাদক মণ্ডলী - Editorial Team:

পাপিয়া চ্যাটার্জী (Papia Chatterjee)
সাকেত শ্রীবাস্তব (Saket Shrivastava)
সুদীপ চক্রবর্তী (Sudeep Chakravarty)

গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং আর্ট ওয়ার্ক –

Graphics Design and Artwork:

দীপাঞ্জন দে (Dipanjan Dey)
সুজয় বিশ্বাস (Sujay Biswas)

অন্বেষণ

রাজযোগ - ক্রিয়াযোগ মিশন - এর মুখপত্র

সপ্তম ডিজিটাল সংখ্যা

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

ওঁ

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম |
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ||

স উ প্রাণস্য প্রাণঃ

রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন

CONTENT

1. Editorial 5
2. ক্রিয়াবানের দিনলিপি (Kriyaban's Diary Entry) 6
3. গুরু-শিষ্য কথা (With English Translation) 7
4. পাপবোধ ও গুরুকৃপা 9
5. Kriya Yoga & Science – Part One 18
6. Mānasaputra – Part 2 22
7. বীর বিবেকানন্দ 28
8. না বলা কথা 29
9. Drops of Nectar (with Hindi Translation) 31
10. The Movement of Hurt 33
11. শিবভূমি ভীমাশংকর 35
12. রাম ত্যাজি, কভু গুরু নাহি ভুলি 40
13. গুরুপূর্ণিমা 44
14. প্রাণস্পর্শ 45
15. तरति शोकमात्मवित् (with English Translation) 47

---

*প্রকাশিত লেখার বক্তব্য লেখকের নিজস্ব এবং এর কোনোওরূপ দায়িত্ব মিশন কর্তৃপক্ষের নয়।

*प्रकाशित आलेखों में व्यक्त किए गए विचार लेखक के निजी हैं, तथा राज योग क्रिया योग मिशन उनके लेख के लिए किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं है

*Views, thoughts, and opinions expressed in the articles belong solely to the author, and not necessarily to the Raj Yoga Kriya Yoga Mission.

Editorial

By the blessings of the holy Master the "**Guru Purnima 2021** edition" of Anweshan is hereby released for the interest of kriyabans and non kriyabans alike. Like the previous year, this year too shall be marked with no celebrations of Guru Purnima at our ashram due to prevailing Covid conditions. Unfortunately, the pandemic took away the life of one of our devoted kriyabans namely **Amol Bhavsar** form Mumbai, Maharashtra. We all kriyabans of Raj Yoga Kriya Yoga Mission do hereby express our deepest condolences to the bereaved family of Late Amol Bhavsar and pray that the departed soul may unify with the Supreme Consciousness.

Having said so, we take this opportunity to convey a vital message of revered Gurudev for sitting down to practice Kriya daily at 06:00 pm in the evening and at a time convenient to self in the morning without fail. In this pandemic situation when the entire world is suffering it becomes all the more important to focus on Kriya which according to the realized Masters is the surest way of knowing the self since self-realization alone is the panacea for all human sufferings. A self-realized man alone is a light to oneself and if one is a light to oneself, he definitely is a light to the world. No wonder all efforts of our revered Gurudev is on making us know that we are the Light, the glimpses of which he already has shown at the time of initiation for which we remain indebted to Him forever.

Though some literatures are useful in traversing the path to self-realization, they are then but mere maps showing topographical location of the place intended to be visited, but for reaching which one has to travel all on one's own efforts. Similar is this magazine with its contents that though undoubtedly helps one in determining his position vis-à-vis the final destination, but then it is the practice of Kriya alone which can propel him towards that dimension, if he really has the intent to know that which however remains unknowable by all means of knowing. This edition of the magazine is offered as a humble offering at the lotus feet of Gurudev on the eve of Guru Purnima on **24.07.2021, Saturday** to bless us all in our quest of the dimensionless so that our individuality gets dissolved in the endless sea of universality so as to usher in Universal Love and Peace.

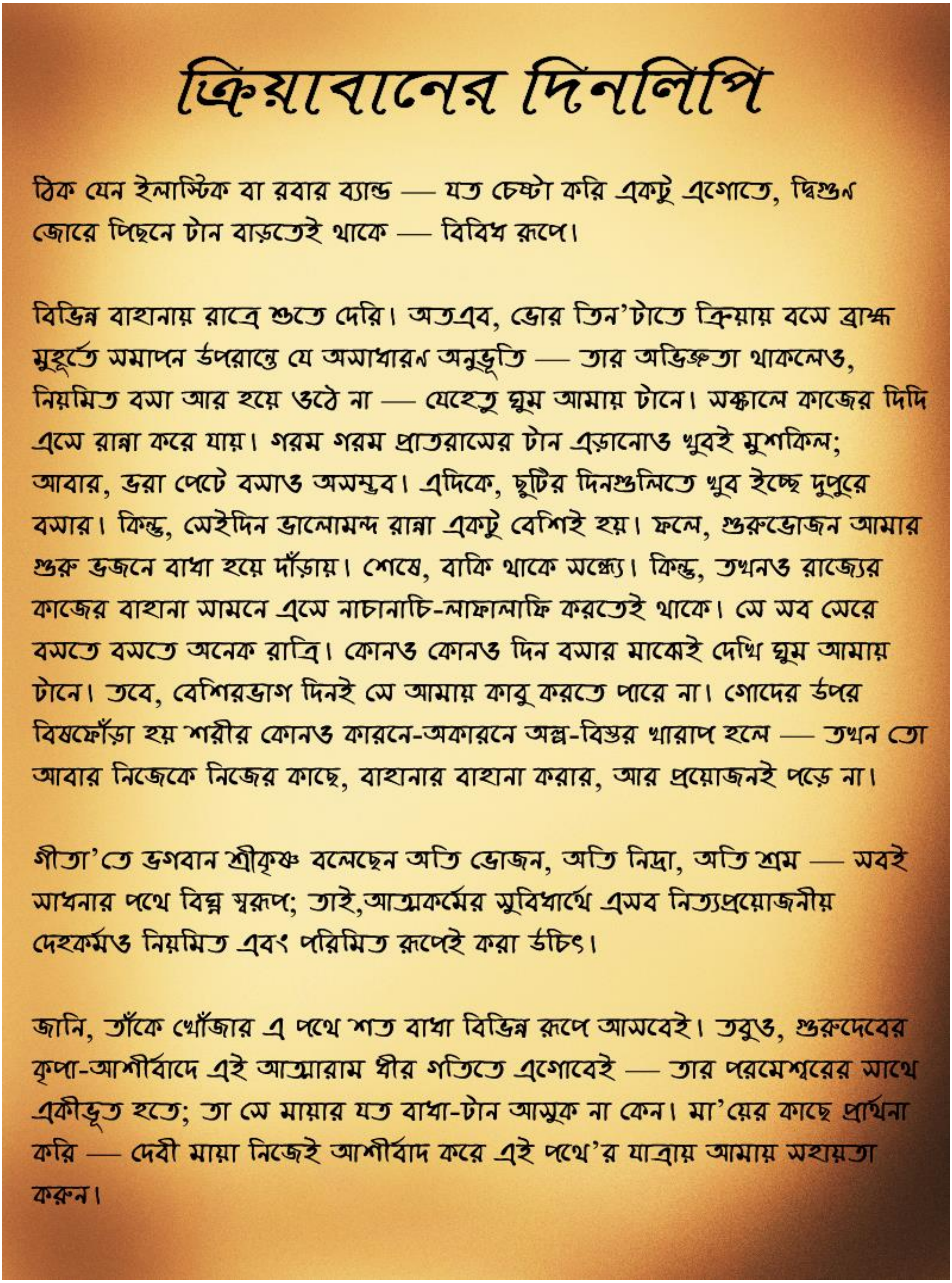

ক্রিয়াবানের দিনলিপি

ঠিক যেন ইলাস্টিক বা রবার ব্যান্ড — যত চেষ্টা করি একটু এগোতে, দ্বিগুন জোরে পিছনে টান বাড়তেই থাকে — বিবিধ রূপে।

বিভিন্ন বাহানায় রাত্রে শুতে দেরি। অতএব, ভোর তিন'টাতে ক্রিয়ায় বসে ব্রাহ্ম মুহূর্তে সমাপন উপরান্তে যে অসাধারন অনুভূতি — তার অভিজ্ঞতা থাকলেও, নিয়মিত বসা আর হয়ে ওঠে না — যেহেতু ঘুম আমায় টানে। সকালে কাজের দিদি এসে রান্না করে যায়। গরম গরম প্রাতরাসের টান এড়ানোও খুবই মুশকিল; আবার, ভরা পেটে বসাও অসম্ভব। এদিকে, ছুটির দিনগুলিতে খুব ইচ্ছে দুপুরে বসার। কিন্তু, সেইদিন ভালোমন্দ রান্না একটু বেশিই হয়। ফলে, গুরুভোজন আমার গুরু ভজনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। শেষে, বাকি থাকে সন্ধ্যে। কিন্তু, তখনও রাজ্যের কাজের বাহানা সামনে এসে নাচানাচি-লাফালাফি করতেই থাকে। সে সব সেরে বসতে বসতে অনেক রাত্রি। কোনও কোনও দিন বসার মাঝেই দেখি ঘুম আমায় টানে। তবে, বেশিরভাগ দিনই সে আমায় কাবু করতে পারে না। গোদের উপরে বিষফোঁড়া হয় শরীর কোনও কারনে-অকারনে অল্প-বিস্তর খারাপ হলে — তখন তো আবার নিজেকে নিজের কাছে, বাহানার বাহানা করার, আর প্রয়োজনই পড়ে না।

গীতা'তে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন অতি ভোজন, অতি নিদ্রা, অতি শ্রম — সবই সাধনার পথে বিঘ্ন স্বরূপ; তাই,আত্মকর্মের সুবিধার্থে এসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দেহকর্মও নিয়মিত এবং পরিমিত রূপেই করা উচিৎ।

জানি, তাঁকে খোঁজার এ পথে শত বাধা বিভিন্ন রূপে আসবেই। তবুও, গুরুদেবের কৃপা-আশীর্বাদে এই আত্মারাম ধীর গতিতে এগোবেই — তার পরমেশ্বরের সাথে একীভূত হতে; তা সে মায়ার যত বাধা-টান আসুক না কেন। মা'য়ের কাছে প্রার্থনা করি — দেবী মায়া নিজেই আশীর্বাদ করে এই পথে'র যাত্রায় আমায় সহায়তা করুন।

“গুরু-শিষ্য কথা”

– আচার্য্য শ্রী ডঃ সুধীন রায়

ক্রিয়াবান’দের মনে প্রশ্ন জাগে, ক্রিয়া করার সময় যেসব উপলব্ধি বা দর্শন হয়, সেই সব দর্শন বা অভিজ্ঞতা কি বিজ্ঞান, না কল্পনা নির্ভর, বাস্তবে ওই সব দর্শন সম্ভব ?

সাধকের মনের প্রকাশ বা সাধারণ মানুষেরও কোন দর্শন, ঘটনা বা উপলব্ধিকে অনেকেই নানা ভাবে তর্ক করে উড়িয়ে দিতে চায়। তারা বলে এসব স্নায়ুঘটিত উত্তেজনা বা স্বাভাবিক রোগই এর কারণ। অনেক সাধক আবার মনে করেন যে সাধনা ভালো হবার জন্য এইসব উপলব্ধি হয়, এই ভেবে নিজেদের’কে অনেক উঁচু স্তরের সাধক বলে মনে করেন আর নিজেদের ক্ষতি নিজেরাই করেন। দর্শনের উপলব্ধি সেইজন্য গুরুদেবের সঙ্গে আলোচনা করে বুঝে নেওয়া উচিৎ। কোন দর্শন ইন্দ্রিয়গত, আর কোন দর্শন আত্মগত - সাধনা করতে করতে সাধক বুঝতে পারে।

অনেকের মতে এইসব দর্শনের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই।

কিন্তু আমরা জানি সাধনকালীন দর্শন - দৃষ্টিভ্রম, বিভ্রান্তি বা কাকতালীয় ঘটনা নয়। ভৌতবিজ্ঞান নানা রকম ভাবে প্রমাণ করতে চায় যে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান ছাড়া যে জ্ঞান, তা সঠিক নয়। মনের যে নানা স্তর আছে তা পরীক্ষায় প্রমাণিত, যা একাগ্রতার উপর নির্ভর করে, এবং উপলব্ধিও মনের নানা স্তরে অবস্থানের ফল।

সাধারণভাবে যারা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত চর্চা করেন বা সংগীতের অনুষ্ঠানে যান, তারা মাঝে মাঝে যখন গায়কের অন্য স্তরের উপলব্ধির প্রকাশ পান, তখন সেই সুরের সঙ্গে তারা যুক্ত হয়ে পড়েন। এই ভাব কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা বোঝা সম্ভব নয়। ইন্দ্রিয়গত মনের প্রকাশ ও আত্মগত মনের প্রকাশ আলাদা হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির মনের ধারণা বা প্রকাশ অবশ্যই সাধারণের থেকে আলাদা হয়।

ক্রিয়াবানের দর্শন অবশ্যই বিবর্তিত মনের এক প্রকাশ। আবার, ঐ দর্শনের রূপ বা আলোর জ্ঞান’ই প্রকাশ করে মানসিক স্তরের অবস্থা।

দর্শন করার ক্ষমতা অনেকের আবার জন্মগত বা অভ্যাসগত ভাবে থাকে। মানসিক গঠন তাদের ঐ রকমই হয়। চিকিৎসা শাস্ত্রে ঐ সব দর্শনের নানা কারণ আছে বলে মনে করা হয়। তবে কোন দর্শন’ই ভুল নয়। অনেক ছবি আমরা দেখি যা আমাদের ভ্রান্তির কারণ হয়। একেক সময় একেক রকম মনে হয়, এই মনে হওয়াটা দৃষ্টিবিভ্রম, ছবিটা কিন্তু সত্য।

দর্শন সাধনাকালীন অবস্থায় হবেই, তাতে সাধক যে রূপ মানসিক অবস্থায় থাকুক না কেন। দর্শন’কে প্রাধান্য দিয়ে নিজেকে ঐ স্তরে আটকে না রেখে গুরুদেবের সাথে কথা বলে সাধনা চালিয়ে যাওয়াই উচিৎ।

(Translation)

Guru-Disciple Talk – Gurudeva Dr. Sudhin Ray

Often the question arises in the minds of Kriya practitioners that is there any science behind the experiences or visions that occur during Kriya meditation or is it just one's figment of imagination. In fact, it is possible to have visions during meditation.

Many people want to dismiss the experiences of the seekers, or the visions of common man, through various arguments that occur during meditation. Stimulation in the nervous system or some kind of psychosis is considered to be the reason for these visions. Many seekers start thinking that visions are the result of their good Kriya practice and do themselves harm by considering themselves as high level seekers. Therefore, by discussing the experiences of visions with the master, its proper interpretations should be understood. Which

visions are occurring at the sensory level and conscious level- the seekers themselves start to understand while doing spiritual practice (Kriya).

Many people believe that no scientific explanation is possible for these visions.

But we know that the visions that occur during Kriya are not illusions, false projections, or accidental events. Physics attempts in various ways to prove that knowledge available without scientific experiment is not real knowledge. The existence of different levels of human consciousness has been proved by experiments, with deep concentration these levels can be reached. Progress of an individual is the result of harmony among these levels.

For instance, people who are interested in classical music or go to concerts, sometimes get a sense of the high-level attainments of the singer, and then they feel a sense of unity with that rāga (melodic mode).

It is impossible to understand this feeling through any examination. There is a difference between an expression of the sensory mind and an expression of the subjective mind. The thought or expression of the mind of an intelligent person is certainly different from that of an ordinary person.

The visions that Kriya practitioner sees during meditation are certainly an expression of the evolved mind. And the form or light of such visions indicates the level of spiritual progress of a seeker.

The ability to have visions is innate or habitual. The mental structure of such persons is different from normal persons. Medical science believes that there must be some reason behind having visions. No vision is false. There are many such pictures (optical illusions) which create confusion in the mind of perceiver. It seems to be different from time to time; that is a kind of illusion, but the picture is true.

Irrespective of the mental state of the seeker, the visions appear naturally during meditation. Giving priority to visions is to limit oneself to a certain level. So, one should always discuss these experiences with his/her Guru or spiritual Master and continue with his/her spiritual practice.

RYKYM Guru Lineage

“পাপবোধ ও গুরুকৃপা”

– অমিত চ্যাটার্জী

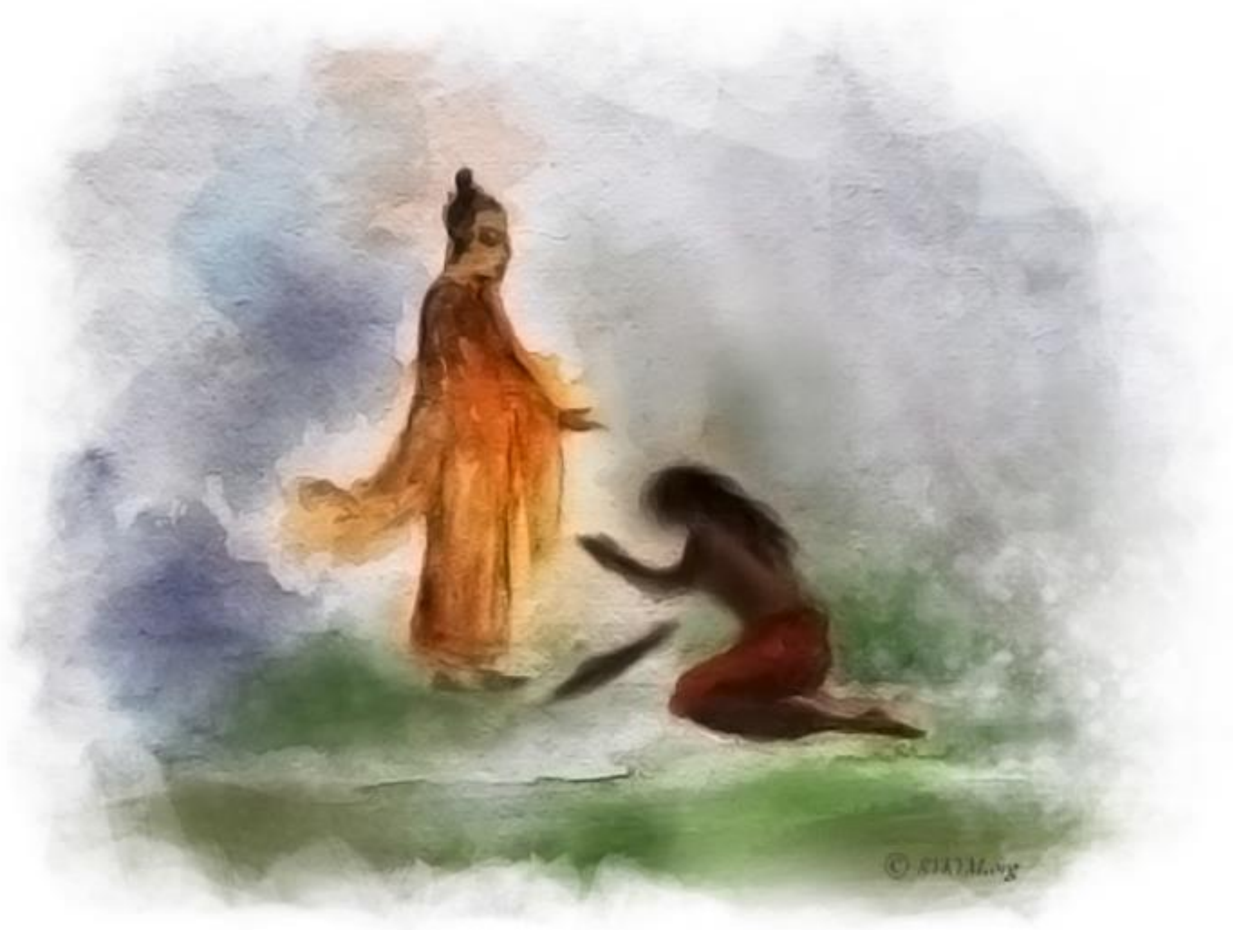

যুগে-যুগে দুঃখ, যাতনা, অভাবপীড়িত, ভোগমুখী, ত্রিতাপদগ্ধ জীবকে শান্তি ও মুক্তির আলো দেখাতে সদ্গুরুর আবির্ভাব ঘটে | তাদের জীবন এবং মার্গদর্শন পথভ্রষ্ট মানুষকে উদ্ধার করে দুঃখ-যন্ত্রণার গ্লানি থেকে | এই মায়ার সংসারে গুরুই পরমাত্মীয়, একমাত্র আপনজন – কারন একমাত্র সদ্গুরুই পারেন এই ভবকারাগার থেকে মুক্ত করতে |

পথে এত অধিক সংখ্যক মায়ার পরীক্ষা আছে- জীবের একার চেষ্টায় এই সুদীর্ঘ পথ উত্তীর্ণ হওয়া প্রায় অসম্ভব | এই দিকে লক্ষ্য করেই পঞ্চানন বাবা লিখেছেন:

গুরু দীপ না জ্বেলে দিলে, আঁধারেতে পথ পাবে না |

অন্ধকারে ঘুরে ঘুরে, কোথায় যাবে ঠিক হবে না ||

আছে ভাঙ্গা ভক্তি, লাঠি, তাতে মায়ার পিছল মাটি |

মোহ গর্তে পোল্লে মাটি, ঘটিবে বিষম যাতনা || -
যোগসংগীত (53)

তাই তো দেখা যায় প্রাচীন কালের ঋষি-মুনি থেকে শুরু করে এ যুগের মহাপুরুষগন সকলেই গুরু চরণে নতমস্তক |

এইরূপ সদ্গুরুর আশ্রয় লাভ সত্বেও আমার জীবনে 'পাপবোধ'এর অন্ত নেই | যে কথা মানুষ সকলের সামনে বলতে পারেনা, যে কাজ সকলের সামনে করতে পারে না - তাই পাপ | এ ধরনের কাজের পেছনে উদ্দেশ্য- প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেহজ ভোগকে চরিতার্থ করা | সেই ভোগ সামগ্রী অর্থ, পরস্ত্রী বা পরপুরুষ, সম্পত্তি, সূরা (বা অন্যান্য নেশার দ্রব্য), অনেক কিছুই হতে পারে | সামগ্রী একত্র করা অন্যায় নয়, তার জন্য অসদুপায় অবলম্বন করা অন্যায় | এই ধরনের অন্যায় কাজের মনস্তাত্ত্বিক পরিনাম 'পাপবোধ' বা 'অপরাধবোধ' | আবার, অন্যায় দেখে তা নিবারণের কোন উপায় করতে না পারলেও মনে এই ধরনের নেতিবাচক আবেগের চাপ সৃষ্টি হতে পারে |

1. মানব জীবনে পাপবোধ:

বেশ কিছুকাল যাবত আমি ক্রিয়া পেয়েছি | মাঝেমধ্যে অল্পস্বল্প অভ্যাসও হয়ে থাকে | তবুও ব্যবহারিক জীবনে আমি বিভিন্ন ধরনের অন্যায় কাজ করেই চলেছি এবং পাপবোধ জনিত মানসিক চাপ অনুভব করছি | আমি শুনেছি যে কাজ মানুষ বারবার করে- তাতে সে বেশ নিপুন হয়ে ওঠে এবং তা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় | তাই জীবনের ঠিক কোন পর্যায়ে 'পাপবোধ' এর বীজ মানব জীবনে প্রবেশ করে, তার সমীক্ষার জন্য জীবনের ঠিক প্রথম থেকে শুরু করা প্রয়োজন:

(i). জীবনের শুরুতেই আমি একজন ছাত্র | এই ছাত্র জীবনে আমি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে পড়াশোনা করি এবং জ্ঞান অর্জনের চেষ্টা করি | সহপাঠীদের এবং অভিভাবকদের কাছে আমি শিখেছি - জ্ঞান নয়, মার্কস অর্জনই ছাত্র জীবনের লক্ষ্য | ভালো মার্কস না পেলে ভালো উচ্চ বিদ্যালয়ে অ্যাডমিশন হবে না, ভালো চাকরি হবে না, এবং জীবন অন্ধকার | অতএব আমার প্রাথমিক লক্ষ্য মার্কস অর্জন | আরো অভিজ্ঞতায় দেখেছি, সব সময় যোগ্যতা এবং পরিশ্রম দিয়েই মার্কস পাওয়া যায় না | তাই আমি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কাছে প্রাইভেট টিউশন পড়তে যাই, ফলে তাদের কয়েকজনের অনুকম্পায় মৌখিক পরীক্ষা এবং প্রজেক্টে অন্যদের থেকে বেশি নম্বর পাই | অনেক শিক্ষক আবার লিখিত পরীক্ষার আগে সাজেশন কোশ্চেন'ও দিয়ে দেন; বলাবাহুল্য, যেহেতু তারাই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি করেন, তাই অধিকাংশ প্রশ্নই কমন থাকে -ফলস্বরূপ আমার রেজাল্ট অন্যদের থেকে ভালো হয় | অনেক সময় ভালো নম্বরের জন্য পরীক্ষায় অসৎ উপায়ও অবলম্বন করে থাকি | এই একই উপায়ে আমি নিম্ন বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে খুব ভালো নম্বর লাভ করতে সমর্থ হয়েছি | অবশ্যই আমি পরিশ্রম করেছি, কিন্তু আমার এই সাফল্যের পেছনে শিক্ষক মহাশয়দের চরণে তৈল ও ঘৃত মর্দন এবং অসৎ উপায় অবলম্বনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে বলেই আমার মনে হয়|

(ii). জীবনের দ্বিতীয় ভাগে, আমি জীবিকার সন্ধানে অগ্রসর | ডিগ্রি এবং পর্যাপ্ত মার্কস আমার আছে- তাই আমি নিজের চাকরি সম্পর্কে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী | বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে আমি চাকরির পরীক্ষা দিয়েছি, এবং বেশ ভালো পরীক্ষা হচ্ছে, কিন্তু "হায়!" চাকরি তো হচ্ছে না | কেন যে হচ্ছে না, তার কোন সঙ্গত কারনই আমি বুঝতে পারছি না | ইতিমধ্যে এটাও জানতে পারলাম, চাকরি পেতে গেলে নম্বর বা যোগ্যতা নয়, প্রয়োজন উপঢৌকন | যেহেতু আমার উপঢৌকন দেওয়ার সামর্থ্য আছে, তাই আমি প্রপার চ্যানেল ধরে উপঢৌকন যথাস্থানে পৌঁছে দিই এবং পরিণাম স্বরূপ কাঙ্খিত চাকরি'টি লাভ করি |

এবার মনে করা যাক, আমার বেশি উপঢৌকন দেওয়ার সামর্থ্য নেই, অতএব জীবিকা নির্বাহ করার জন্য আমি ব্যবসার দিকে প্রযত্নশীল | ব্যবসার জন্য বিভিন্ন জায়গার অনুমতি পত্র লাগে, সেখানেও মিষ্টি এবং উপঢৌকন প্রিয় ব্যক্তিদের অভাব নেই | তাদের সন্তুষ্ট করে কোনওক্রমে আমি ব্যবসা দাঁড় করাই | এবার তৃতীয় সম্ভাবনা হলো, আর্থিকভাবে আমার কোন ক্ষমতাই নেই | সেক্ষেত্রে, ভাগ্য খুব ভাল না হলে, আমি সমাজবিরোধী | ধীরে ধীরে চুরি, ডাকাতি সহ সমস্ত অসামাজিক কাজেই আমি অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে উঠেছি|

(iii). জীবনের তৃতীয় অধ্যায় কর্মজীবন | প্রথম চরিত্রে আমি চাকুরীজীবী, দশটা পাঁচটা’র অফিস | অফিসেও পদোন্নতির জন্য যোগ্যতা অপেক্ষা কূটনৈতিক বুদ্ধি বেশি প্রয়োজন | ফলে উন্নতির জন্য আমিও অফিস পলিটিক্স’এ অংশগ্রহণ করি | তাতে অপরের অধিকার খর্ব করেও নিজের উন্নতিতে সচেষ্ট হই | অফিস পলিটিক্স’এ পারদর্শী না হলে, আমার অধিকার খর্ব করে অন্যরা এগিয়ে যায় এবং অন্যায় দেখেও আমি চুপ করে থাকি | আর আমি যখন ব্যবসায়ী, সুষ্ঠভাবে ব্যবসা পরিচালনার জন্য বহু ধরনের ব্যক্তিদের সম্মান দক্ষিণা দিতে হয় | যদিও আমি জানি এটা অন্যায়, তবুও আমি নিরুপায় |

(iv). শেষ অধ্যায়ে, অবসর গ্রহণের সময় সেই মিষ্টি প্রেমী ব্যক্তিদের আবার আবির্ভাব হয় | মিষ্টি দ্বারা তাদের পেট ও পকেটকে সন্তুষ্ট করতে পারলে তবেই অবসরকালীন পাওনাগন্ডার সমস্ত ফর্মালিটি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হয় |

(v). বর্তমান জীবনের আরও একটা বড় অঙ্গ বিনোদন | ছোটবেলা থেকেই বিভিন্ন টিভি সিরিয়াল এবং সিনেমার মাধ্যমে আমি জানতে পেরেছি, মানব জীবনের মূল লক্ষ্য ভবিষ্যত জীবনসঙ্গীর সন্ধান এবং দৈহিক আকর্ষণ’ই শ্বাশত | ছোট থেকে বারবার একই জিনিস দেখার ফলে আমার মনে একটি কৃত্রিম চাহিদা তৈরি হয়েছে | তারপর বিভিন্ন ও.টি.টি. প্ল্যাটফর্ম’এর ওয়েব সিরিজ’এর প্রভাবে মনে হয়েছে, নর-নারীর আদিম রিপু’ই জীবনের কেন্দ্র | তাই আমি এক প্রেমিক বা প্রেমিকার সন্ধান করেছি আদিম রিপু চরিতার্থ করার জন্য | সফল হলে সেই সুখেই ডুবে থেকেছি, আর বিফল হলে ভার্চুয়াল রিয়েলিটির মাধ্যমে কৃত্রিম চাহিদা প্রশমিত করেছি |

(vi). বিনোদন আমায় আরো শিখিয়েছে সিগারেট, মদ এবং বিভিন্ন ধরনের নেশাও সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক | তাই দেখানো হয়, উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরা এবং সিনেমার অভিনেতারা এই ধরনের নেশা করে থাকেন | যেহেতু মন সততই অনুকরণ প্রবণ, তাই তাদের দেখাদেখি আমিও বিভিন্ন ধরনের নেশায় নিজের জীবন তরী ডুবিয়ে দিয়েছি | এছাড়াও যে ধরনের ভাষা ওয়েব সিরিজে ব্যবহৃত হয়, সেই ভাষার প্রভাবে আমার ভাষাতেও সমস্ত ‘মধুর বচন’ এসে জুটেছে|

ঈশ্বর আমায় একটি মানব শরীর দিয়েছেন এবং এর মধ্যে বিবেক নামক একটি বস্তু আছে, যার দ্বারা আমি নীতি এবং দুর্নীতি’র তফাৎ বুঝতে পারি | যেহেতু এই বিবেককে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার কোন উপায় আবিষ্কৃত হয়নি, -তাই জীবনের যে কোন স্তরে নীতি পথ থেকে বিচ্যুত হলে অথবা দুর্নীতি দেখেও চুপ করে থাকলে বিবেকের তাড়না অনুভব করি | এবিষয়ে কবিগুরু বলেছেন:

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে

তব ঘৃণা তারে যেন তৃণ সম দহে |

অর্থাৎ অন্যায়কারী এবং অন্যায় সহনকারী উভয়েই পাপবোধের আগুনে দগ্ধ হয় | এযুগের যুগধর্ম - মানুষের অসীম চাহিদা এবং সেজন্য তার সর্বদা প্রচেষ্টা | সেই কারণেই, ছোটবেলাতেই মানব শিশুর মধ্যে ভোগের বীজ বপন করা হয়। দেওয়া হয় যে কোনো মূল্যেই কাঙ্খিত ভোগ’কে ছিনিয়ে নেওয়ার শিক্ষা, তা ন্যায় বা অন্যায় যে পথেই হোক না কেন | সময়ের সাথে সেই বীজ আজ মহীরুহে পরিণত হয়েছে, - সুতরাং জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি বিভিন্ন ধরনের অন্যায় করে এসেছি এবং দীর্ঘদিনের অভ্যাসবশত এখনো করে চলেছি | ক্রিয়া লাভের পর যখন কিছুটা সম্বিৎ ফিরে পেয়েছি, তখন পাপবোধের আশঙ্কা আমায় গ্রাস করছে | চেষ্টা করেও আদর্শ পবিত্র জীবন লাভ হচ্ছে না এবং নিজেকে সঠিক মানসিক অবস্থায় ধরে রাখতেও পারছি না বলেই আমার মনে হয় |

2. পাপবোধ ও গীতা:

গীতার প্রথম অধ্যায়ে দেখা যায়, শিষ্যশ্রেষ্ঠ অর্জুনও কুরুক্ষেত্র'এর সাধন সংগ্রামে শত্রুপক্ষের যোদ্ধাদের হত্যাজনিত পাপ বোধের আশঙ্কায় ভীত:

পাপমেবাশ্রয়ে দস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ। (1/36)

অর্থ : "এই সব আততায়ীগণকে হত্যা করলে আমাদের পাপই হবে |"

অতঃপর 38 এবং 44 নম্বর শ্লোকে তিনি পুনরায় নিজের আশঙ্কা ব্যক্ত করলেন:

কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্ |
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন || (1/38)

অর্থ : "হে জনার্দন ! কুলক্ষয়জনিত পাপ লক্ষ্য করেও কেন আমাদের তাতে নিবৃত হবার জ্ঞান হবে না ?"

অহো বত মহৎ পাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হস্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ।। (1/44)

অর্থ :"হায় ! আমরা রাজ্যসুখলোভে স্বজনকে বিনাশ করতে উদ্যত হয়ে মহাপাপে প্রবৃত্ত হয়েছি|"

অর্জুনের মানসিক স্থিতি এতটাই বিপর্যস্ত, যে তার শরীরে কম্পন ও রোমাঞ্চ হচ্ছে | হাত থেকে গান্ডীব খসে পড়ছে এবং তার সমুদয় ত্বক যেন দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে | সর্বশেষে শোকাকুল হয়ে অর্জুন ধনুর্বাণ ত্যাগ করলেন অর্থাৎ সাধনা পরিত্যাগ করলেন (1/29 & 1/46) | সুতরাং দেখা যাচ্ছে অপরাধ বা পাপবোধও যোগসাধনার পথে এক প্রবল শত্রু, যা সদ্গুরুর আশ্রিত শ্রেষ্ঠ যোগ্যতাসম্পন্ন শিষ্যকেও সাধনা ত্যাগে বাধ্য করতে পারে |

3. গুরুকৃপা:

এরূপ প্রতিকূল অবস্থায়, শরণাগত শিষ্য অর্জুনকে রক্ষা করার জন্য সদগুরু কৃষ্ণ স্বয়ং তার মার্গদর্শন করলেন | প্রদান করলেন গীতাজ্ঞান | সেই জ্ঞানের আলোকে অর্জুন হলেন সাধনসমরে বিজয়ী | কিন্তু অর্জুনের পাপবোধের আশঙ্কা এবং আমি কৃত অপরাধের মধ্যে 'আকাশ-পাতাল তফাৎ' বললে আকাশ ও পাতাল এর মধ্যবর্তী দূরত্ব কে অপমান করা হয় | তাই মুক্তি বা উন্নতি সম্পর্কে আমি যথেষ্ট সন্দিহান এবং পরিণাম স্বরূপ অধিকাংশ সময়ই অত্যন্ত হতাশাগ্রস্থ | এমন অবস্থায় আমার মত ব্যক্তিদের কি সত্যিই কোনো আশা অবশিষ্ট আছে ?

এরূপ দ্বন্দপীড়িত মানসিক পরিস্থিতিতে গুরুকৃপায় সদগুরুসত্তার ধারক মহাপুরুষদের জীবনী পাঠের সুযোগ ঘটে | তাদের জীবনী পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সামাজিক দৃষ্টিতে যে সমস্ত ব্যক্তিদের আমরা পতিত, ব্রাত্য, কলুষিত, বা হিংস্র বলে দূরে সরিয়ে দিই, 'পরশ পাথর' সদ্গুরুর ক্ষণিক স্পর্শ'ও তাদের জীবনেও আনে আমূল পরিবর্তন | অতঃপর দেখা যায় তারা সত্য, নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্যের পথে অগ্রসর হয়ে সততই ঈশ্বরীয় আনন্দে বিচরণ করতে সক্ষম হন | তারই কিছু দৃষ্টান্ত নিচে প্রস্তুত করা হল:

3.1. চৈতন্য মহাপ্রভু ও জাগাই-মাধাই:

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী বা চৈতন্য মহাপ্রভু বাংলা তথা ভারতবর্ষের আধ্যাত্ম আকাশে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র | ভক্তদের দৃষ্টিতে তিনি সাক্ষাৎ শ্রী রাধা কৃষ্ণের অবতার | খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতকে আবির্ভূত এই অবতার তৎকালীন জনগন কে কৃষ্ণভক্তির বন্যায় ভাসিয়ে দিলেন, প্রতিষ্ঠা করলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় |

চৈতন্য মহাপ্রভুর দুইজন পার্ষদ অবধূত নিত্যানন্দ এবং যবন হরিদাস সোল্লাসে নাম গান করতে করতে নবদ্বীপের রাস্তা দিয়ে চলেছেন | হঠাৎ দেখলেন দুই মূর্তিমান বিভীষিকা - জগাই ও মাধাই পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে | এই দুই ভাই'এর প্রথম জীবনের চিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখেছেন (চৈ. ভা. মধ্য খন্ড, 13 অধ্যায়):

একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল | মহাদস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল ||

সে দুইজনার কথা কহিতে অপার | তারা নাহি করে হেনো পাপ নাহি আর | |

ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গোমাংস ভক্ষন | ডাকা, চুরি, পর গৃহদাহে সর্বক্ষণ ||

দুইজন পথে পড়ি গড়াগড়ি যায় | যে যাহারে পায় সে তাহারে কিলায় ||

ক্ষণে দুইজনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চুলে | চকার বকার শব্দ
উচ্চ করি বলে ||

এরূপ দুর্বৃত্তদের দেখে এবং তাদের এই সমস্ত চরিত্রগত ত্রুটি, যথাঃ মদ্যপান, গোমাংস ভক্ষণ, চুরি, ডাকাতি, ইত্যাদি সম্পর্কে অবগত হয়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মনে করুনার সঞ্চার হল:

শুনি নিত্যানন্দ বড় কারুণ্য হৃদয় | দুইর উদ্ধার চিন্তে হইলা
সদয় ||

পাতকি তরিতে প্রভু কইলা অবতার | এমতো পাতকি
কোথা পাইবেন আর ||

এখানে প্রভু অর্থ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য দেবের কথা বলা হয়েছে | প্রভু নিত্যানন্দ ছিলেন প্রেম ও করুণার মূর্ত প্রতীক, তার হৃদয় যখন একবার বিগলিত হয়েছে জগাই মাধাই'এর আর নিস্তার নেই | তাই শুরু হলো জগাই মাধাই উদ্ধার লীলা | কিছুদিন পরে হঠাৎ নিতাই ও হরিদাস আবার জগাই-মাধাই এর সামনে গিয়ে পড়লেন | সাধুদ্বয় তখন নামের নেশায় উন্মত্ত, আর জগাই মাধাই সুরার নেশায় | এমন অবস্থায় কৃষ্ণ নাম কানে যাওয়ায় দুই ভাইয়ের নেশায় বিঘ্ন পড়েছে - তাই তারা ক্ষেপে উঠলো | তখন নিতাই করে বসলেন এক অভাবনীয় কান্ড | দুই মদ্যপের সামনাসামনি হয়ে, তাদের উদ্দেশ্য করে বললেন – "ভাই, আমি তোমাদের কৃষ্ণ নাম শোনাবো বলে এসেছি | আমি এক অবধূত |" জ্বলন্ত আগুনে যেন ঘি পড়লো | নেশাগ্রস্ত মাধাই এবার ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে একটা ভাঙ্গা কলসি রাস্তার উপর থেকে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে দিলেন নিতাইয়ের মাথা লক্ষ্য করে | নিতাইয়ের আহত মস্তক থেকে দরদর করে রক্ত ধারা বইতে লাগলো, কিন্তু সেদিকে অবধূত'এর লক্ষ্য নেই | তিনি মিটিমিটি হাসছেন- আসলে গৌরাঙ্গ'কে এই দুই ভাইয়ের উদ্ধারের জন্য সেই স্থানে নিয়ে আসার উপলক্ষেই প্রভু নিত্যানন্দর এই লীলা |

মাধাই'এর ক্রোধ আরো উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে | তিনি নিতাই'কে আরো প্রহার করতে উদ্যত, কিন্তু জগাই'এর এইসব ভালো লাগলো না | এই নিরস্ত্র সৌম্যকান্তি সাধুর উপর অত্যাচার করে তাদের গৌরব কিছু পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে না, তাই জগাই তার ভাইকে নিরস্ত করলেন | সংবাদ পেয়ে এতক্ষণে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পৌঁছেছেন সেই স্থানে | প্রাণপ্রিয় নিত্যানন্দের এই পরিস্থিতি দেখে গৌরাঙ্গের গৌরকান্তি শ্রীঅঙ্গ ক্রোধে রক্তবর্ণ ধারণ করেছে | নিতাইয়ের এই অবস্থা যারা করেছে তাদের বিনাশ আজ অনিবার্য | পাতকী উদ্ধারের পরিকল্পনা যাতে ব্যর্থ না হয়ে যায়, তাই নিত্যানন্দ বাধা দিলেন – "প্রভু তুমি শান্ত হও, এরা যে মহাপাপী | তোমার কৃপা প্রসাদের যে সবার আগে এদেরই প্রয়োজন | তাছাড়া তুমি তো জানো না, ক্রোধে ক্ষিপ্তপ্রায় মাধাই আমাকে হয়তো একবারে মেরে ফেলতো, কিন্তু জগাই তাকে বাধা দিয়েছে | তাইতো আমার প্রাণ রক্ষা হল |" নিত্যানন্দর এই প্রার্থনায় গৌরাঙ্গ আবার তার গৌরসুন্দর রূপে ফিরে এলেন | জগাইয়ের প্রতি আজ তিনি বড়ই সন্তুষ্ট, সে তার প্রাণপ্রিয় নিতাইয়ের প্রাণ রক্ষা করেছে| সে আজ তার বড়ই আপনজন | দুই বাহু প্রসারিত করে জগাইকে আলিঙ্গন করলেন মহাপ্রভু, দিলেন কৃষ্ণপ্রেম | প্রভুর স্পর্শে এবং তার প্রেমাবেশে জগাই সংজ্ঞা হারিয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ল | এদিকে প্রভু দর্শনে মাধইয়ের পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হতে শুরু করেছে | যত অপরাধ দুই ভাই একসাথে করেছে; কিন্তু, কৃষ্ণ প্রেম শুধু জগাই পেল | নিত্যানন্দর প্রতি আচরণে সে অনুতপ্ত; সে কাতর কণ্ঠে বারবার প্রভুর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে লাগলো | সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে প্রভু তাকেও সেই পরম ধন দিলেন | প্রভুর কৃপা লাভের পর দুইজনের জীবনে দেখা যায় আমূল পরিবর্তন | দুজনেই সমস্ত সম্পত্তি ত্যাগ করে হয়ে ওঠেন পরম বৈষ্ণব | গঙ্গার তীরে একটি কুটির তৈরি করে সেখানে জপ-ধ্যান এবং নারায়ণ সেবায় নিজের অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন | ভক্তপ্রবর মাধাই গঙ্গাস্নানে আসা নর-নারীর সুবিধার্থে কোদাল দ্বারা সম্পূর্ণ নিজের পরিশ্রমে একটি ঘাট নির্মাণ করেন যা আজও 'মাধাই এর ঘাট' নামে সুপরিচিত |

3.2. স্বামী রাম ও জনৈক গণিকা:

স্বামী রাম'এর জন্ম ভারতের গাড়োয়াল হিমালয়ে টৌলি নামক এক ছোট্ট গ্রামে | খুব অল্প বয়সে গুরু বাঙালি বাবার সান্নিধ্যে এসে গৃহত্যাগ করেন এবং হিমালয়ের গিরিগুহায় কঠোর সাধনায় মগ্ন হন | ব্রহ্মবিদ্যার যে ধারায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেন তার নাম শ্রীবিদ্যা বা শ্রীসাধনা | তার তপনিষ্ঠা এবং শাস্ত্রজ্ঞানের ব্যাপ্তি দক্ষিনে করবিরপিঠম এর শঙ্করাচার্য ডক্টর

কুর্তাকোটিকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে, এবং তাকে পরবর্তী শঙ্করাচার্য রূপে মনোনীত করা হয়|

স্বামী রাম একবার নিজের গুরুদেবের আদেশে দার্জিলিং শহরের বাইরের এক শ্মশানে বিশেষ ধরনের সাধনায় ব্রতী হন | ৪১ দিনের সাধনার ৩৯ দিন অতিবাহিত হলেও তেমন কিছুই ঘটল না, পরিনামস্বরূপ তার মনে এই সাধনার বিরুদ্ধে বিভিন্ন বিপরীত চিন্তার উদয় হতে লাগল | তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে জল ঢেলে দিলেন এবং তার অস্থায়ী বাসস্থান খরের কুঁড়েঘরটি ভেঙে দিয়ে সেই স্থান পরিত্যাগ করার উপক্রম করতে লাগলেন | সাধনস্থল থেকে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে তিনি শুনতে পেলেন, একটি বাড়ি থেকে গান এবং নাচ এর আওয়াজ ভেসে আসছে | গানের বিষয়বস্তু ছিল, “জীবনের প্রদীপে অত্যন্ত অল্প তেল ছিল, কিন্তু রাত ছিল দীর্ঘতর |” এই একটি লাইন স্বামীজীকে অনুপ্রাণিত করে এবং তিনি ফিরে গিয়ে সাধনা সম্পূর্ণ করেন | সাধনার শেষে অর্থাৎ ৪১ তম দিনে সত্যিই অনুশীলনের সেই ফলের উদ্ভব হলো, যেমন তার গুরুদেব বলেছিলেন | সাধনা শেষে যখন তিনি সেই গায়িকার বাড়িতে উপস্থিত হন, তিনি আবিষ্কার করেন সে ছিল একজন বিখ্যাত গণিকা | তরুণ সন্ন্যাসীকে বাড়িতে প্রবেশ করতে দেখে, ভৃত্যস্থানীয় এক শক্তিশালী ব্যক্তি তাকে সেই স্থানে প্রবেশ করতে বাধা দেন- “থামুন তরুণ স্বামী, আপনার জন্য এটি অনৈতিক স্থান |” উত্তরে স্বামীজি বললেন, “না, আমি তার সঙ্গেই দেখা করতে চাই | তিনি আমার মাতৃসম |” তারপর সমস্ত বৃত্তান্ত তাকে জানালেন; সব শুনে গণিকা দরজা খুলে দিলেন এবং স্বামীজীকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিলেন | স্বামীজীর ক্ষণিক উপস্থিতি এবং তার দিব্য প্রভাবে গণিকার অন্তঃকরণে নতুন চেতনার উন্মেষ হয় | তিনি তৎক্ষণাৎ বেশ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করেন এবং স্বামীজিকে কথা দেন- “আজ থেকে আমি তোমার মায়ের মতোই থাকব কথা দিলাম | আমি প্রমাণ করব যে আমি শুধু তোমারি মা হতে পারি তা নয়, আমি সকলেরই মা হলাম |”

পরের দিনই তিনি কাশীধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং পরবর্তী জীবন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পিত করেন | তিনি তার বাসস্থানের সম্মুখে লিখে রেখেছিলেন – “আমাকে কোন সাধিকা বলে ভুল করোনা | আমি ছিলাম এক বেশ্যা মাত্র | দয়া করে আমার পায়ে স্পর্শ করে প্রণাম কোরো না |” এই পরিবর্তিত জীবনে তিনি কারো সাথে কথা বলেননি বা কাউকে সরাসরি তাকিয়ে দেখেননি | যদি কেউ তাকে কখনো জিজ্ঞাসা করত- “আপনি কেমন আছেন?” উত্তর আসতো –“রাম”, অন্য কোন শব্দ নয় | মহাপ্রয়াণের একদিন পূর্বে প্রায় ৫-৬ হাজার ভক্তের সামনে এই সাধিকা ঘোষণা করলেন, “আমি খুব ভোরে চলে যাচ্ছি, দয়া করে এই নশ্বর দেহটিকে গঙ্গায় ফেলে দেবেন | তবে এটি মাছের খাদ্য হিসেবেও যদি বা কাজে লাগে |” পরের দিন উক্ত সময়েই তিনি দেহত্যাগ করেন |

3.3. বুদ্ধ ও অঙ্গুলিমাল:

বৌদ্ধ ধর্ম ও অষ্টাঙ্গমার্গের প্রবর্তক হিসেবে গৌতম বুদ্ধের নাম আমাদের সবার জানা | তার অনাপানাস্তি ধ্যান প্রাণ এবং অপান বায়ুর এক ক্রিয়া বিশেষ, এবং মধ্যম মার্গ সুক্ষস্তরে ইড়া এবং পিঙ্গলার মধ্যবর্তী সুষুম্নামার্গ বলেই মনে হয় |

ধর্ম প্রচার কাজে গৌতম বুদ্ধ একবার কৌশল রাজ্যে উপস্থিত হন | কৌশলের প্রজারা কিছুকাল যাবৎ আসুরিক স্বভাব সম্পন্ন এক দুর্ধর্ষ হত্যাকারীর অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে | এই হত্যাকারী নিরীহ প্রজাদের প্রাণান্ত ঘটিয়ে তাদের অঙ্গুলির মালা নিজের গলায় পরতো, তাই তার নাম দেওয়া হয়েছিল অঙ্গুলিমাল | মহারাজ প্রসেনজিৎ এবং তার সুবিশাল সৈন্যবাহিনী বহু প্রচেষ্টার পরেও তাকে দমন করতে অসমর্থ হন |

বিভিন্ন সুত্র অনুযায়ী, অঙ্গুলিমাল জন্ম থেকে এইরূপ বিক্ষিপ্তমতি ছিলেন না | তার পূর্বাশ্রমের নাম ছিল অহিংসক | সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম | বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, তাই শিক্ষালাভের জন্য তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালযয়ে প্রবেশ অধিকার লাভ করেন | প্রত্যেক বিষয়েই অহিংসকের অসাধারণ দক্ষতা ছিল | সহপাঠীর এই উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে অন্য ছাত্ররা শিক্ষকের কাছে নানা কাল্পনিক অভিযোগ করে | পরিণামস্বরূপ, যাতে অহিংসক তার শিক্ষা সম্পূর্ণ না করতে পারে, তাই শিক্ষক তাকে একটি অসম্ভব পরীক্ষা দিলেন - সহস্র ব্যক্তির আঙ্গুল কেটে আনতে হবে | শিক্ষকের আদেশ শিরোধার্য করে অহিংসক এই ঘৃণিত কাজে ব্রতী হন এবং ধীরে ধীরে অঙ্গুলিমাল হয়ে ওঠেন | ইতিমধ্যেই অঙ্গুলিমাল ৯৯৯ জনকে হত্যা করেছেন, রক্তপাত

প্রাণহানি এবং অসহায় মানুষের আর্তনাদ তাকে নরপশুতে পরিণত করেছে | এমত অবস্থায় অঙ্গুলিমালের জীবনে বুদ্ধ উপস্থিত হলেন | কৌশলের একপ্রান্তে পৌঁছানোর জন্য বুদ্ধ স্থির করলেন, অঙ্গুলিমালের বাসস্থানের কাছাকাছি এক রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হবেন | কিছুদূর অগ্রসর হয়েছেন, এমন অবস্থায় চারিদিক বিদীর্ণ করে এক ভয়ানক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো- “থামো”| চলতে চলতেই অকুতোভয় বুদ্ধদেব উত্তরে বললেন- “আমিতো থেমেই আছি বাবা, বরং তুমি এবার থামো |” বলাবাহুল্য, বুদ্ধদেব এখানে থামা শব্দে মনের স্থিরত্বের কথা বলেছিলেন | তিনি দীর্ঘকাল কঠোর তপস্যা দ্বারা কামনা বাসনার সমস্ত বীজ নষ্ট করে উপনীত হয়েছেন ‘বুদ্ধত্ব’ বা চরম স্থিরত্বে | কিন্তু অঙ্গুলিমালের চিত্ত ক্রমাগত জীবহিংসা দ্বারা এতটাই বিক্ষিপ্ত এবং অশান্ত যে তার বৌদ্ধিক স্তর একটি হিংস্র পশুর সমান হয়ে গেছে | নিশ্চিত মৃত্যুর সামনে এই যুগপৎ প্রশান্তি এবং তেজস্বিতা অঙ্গুলিমাল’এর মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটায় | তারপর তাদের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল তা মহাকালই জানেন | বুদ্ধের কৃপায় অঙ্গুলিমাল তৎক্ষণাৎ অস্ত্র ত্যাগ করেন এবং দীক্ষা লাভ করে অগ্রসর হন যোগ পথে |

কিছুকাল পরের কথা, নতুন ভিক্ষুকে সঙ্গে নিয়ে বুদ্ধদেব এসেছেন শ্রাবস্তীর জেতবনে | সেখানে রাজা প্রসেনজিৎ’এর সাথে বুদ্ধের সাক্ষাৎ হয় এবং কথা প্রসঙ্গে তিনি অঙ্গুলিমালের অত্যাচারের কথা বুদ্ধকে জানান | বুদ্ধ স্মিতহেসে মহারাজের উদ্দেশ্যে বললেন – “মহারাজ, এই মুহূর্তে যদি আমি সমবেত ভিক্ষুদের মধ্যে অঙ্গুলিমালকে দেখাতে পারি, তবে আপনি তাকে নিয়ে কী করবেন?” প্রসেনজিৎ যুগপৎ বিস্মিত এবং ভীত হয়ে চমকে উঠলেন | নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি বুদ্ধকে আশ্বস্ত করে বলেন, যে সে ক্ষেত্রে শ্রমনের প্রাপ্য সম্মান অঙ্গুলিমালকে দেওয়া হবে | কালকের বিভীষিকা, আজকের বৈরাগী | মুণ্ডিত মস্তক, গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে অঙ্গুলিমাল বসে ছিলেন বুদ্ধের কাছেই | বুদ্ধ নীরবে নিজের নবীন শিষ্যটিকে দেখিয়ে দিলেন | এই অভাবনীয় রূপান্তরে রাজা প্রসেনজিৎ হতচকিত; কিন্তু কর্তব্যনিষ্ঠা তার প্রবল | তাই তার সমস্ত অপরাধ মহারাজ ক্ষমা করেন এবং নবীন ভিক্ষুকে সুন্দর মূল্যবান পরিচ্ছদ, অলংকার এবং একটি সুদৃশ্য ভবন উপহারস্বরূপ দিতে চেয়েছিলেন | কিন্তু এ তো আর লোভগ্রস্ত দস্যু অঙ্গুলিমাল নয়, তার সমস্ত বিকার বুদ্ধের তপপ্রভাবে ভস্মীভূত | এই অঙ্গুলিমাল - ভিক্ষু, বুদ্ধের শিষ্য, সর্বত্যাগী, সর্বমোহমুক্ত | সদগুরু রূপ ‘পরশ পাথর’ স্পর্শে সে যে বিশুদ্ধ কাঞ্চনে পরিণত হয়েছে | তাই অঙ্গুলিমাল এই নিবেদনের উত্তরে নিজের বস্ত্র দেখিয়ে বললেন- “মহারাজ! এই দেখুন আমার যা কিছু প্রয়োজন আমার ঠিকই আছে, এর বেশি আর কিছুই তো আমার লাগছে না |”

ক্রমাগত ১০ -১২ বছর বুদ্ধদেবের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ এবং নিষ্ঠা ও অধ্যাবসায়ের সাথে সাধনা করে অত্যন্ত উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হন | বুদ্ধদেব পরবর্তীকালে কৌশল রাজ্যে ধর্মপ্রচারের জন্য তাকেই মনোনীত করেন |

3.4. লাহিড়ী বাবা ও কালিবাবু:

যোগীরাজ লাহিড়ী বাবা ক্রিয়া যোগের গৃহী পরম্পরার জনক | ক্রিয়াবান মাত্রই যোগীরাজ সম্পর্কে অবগত | তার জীবনের প্রত্যেক ঘটনা বা লীলার অবতারণা ভক্ত শিষ্যদের পথ প্রদর্শনের জন্য হয়েছিল বলেই মনে হয়|

লাহিড়ী বাবার এক অনুরাগী হরি নারায়ন মুখোপাধ্যায় কাশিতে ডাক ও তার বিভাগে কর্মরত ছিলেন | কালিপদবাবু নামক তার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য ঘরে স্ত্রী থাকা সত্বেও বিপথগামী ছিলেন | যথার্থ বন্ধু হিতৈষী হরিবাবু বন্ধুকে ইন্দ্রিয়পরায়নতাজনিত বিপথগমন থেকে ফেরাবার জন্য বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন| তখন তিনি মনস্থ করলেন, যে কোন উপায়ে কালিবাবুকে যোগীরাজ’এর নিকট নিয়ে যেতে হবে | যোগীরাজের সান্নিধ্যে সে কোন ভাবেই আর বিপথগামী হতে পারবে না | কিন্তু রিপুর বিকারে উন্মত্ত ব্যক্তি কি নিজেকে অসুস্থ বলে মেনে নেয় এবং বৈদ্যর কাছে সহজে যেতে চায়? এক্ষেত্রেও ঘটল একই ঘটনা| কালিবাবু কিছুতেই রাজি হলেন না, বরং লাহিড়ী বাবা সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলেন | আরাধ্য সম্পর্কে নানা বিরূপ মন্তব্য শোনার পরেও বিচলিত না হয়ে হরিবাবু উক্ত বিষয়ে বারবার চেষ্টা করতে লাগলেন | এইভাবে কিছুদিন গত হওয়ার পর পরিশেষে কালিবাবু যোগীরাজ দর্শনে রাজি হলেন, এবং একদিন সন্ধ্যার সময় দুই বন্ধু গেলেন যোগীরাজ’এর নিকট | যোগীরাজ তখন ভক্তদের বিভিন্ন ধার্মিক ও তাত্ত্বিক বিষয়ে

উপদেশ দিচ্ছিলেন | পুরান পুরুষ লাহিড়ী বাবার সান্নিধ্য ও উপদেশ স্বাভাবিকভাবেই কালিবাবুর অন্তঃকরণকে আলোড়িত করে | সভাশেষে সেদিন তিনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু এক অমোঘ চৌম্বকীয় আকর্ষণ তাকে বার বার টেনে আনল যোগীরাজ’এর চরণে | এরপর থেকে কালিবাবু সমস্ত কুঅভ্যাস ত্যাগ করে সৎপথে সংসারধর্ম পালন করতে আরম্ভ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই যোগক্রিয়া লাভ করে যোগ সাধনায় ব্রতী হন | আচার্য অশোক চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পুরান পুরুষ গ্রন্থে এই ঘটনা উদ্ধৃত করে লিখেছেন – “এইভাবে দেখা যায় কত বিপথগামী ব্যক্তি তাহার সান্নিধ্যে আসিবা মাত্র তাহাদের মনের গতি বদল হইত, তাহারা সৎ জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতো |”

পরবর্তীকালে যোগীরাজ এর অন্য এক ভক্ত মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পাপবোধে অস্থির এবং উৎকণ্ঠিত হয়ে যোগীরাজ কে পত্র লেখেন: **“কৃত পাপের জন্য সর্বদা অস্থির ও উৎকণ্ঠিত | এ জন্মে কোনোরূপ সদানুষ্ঠান করি তার ক্ষমতা নাই এবং জন্মান্তরেও যে পারিব সে আশা নাই | এ জীব নিতান্ত কাল ভয়ে ভীত** |” তার উত্তরে যোগীরাজ’এর উপদেশ: **“পাপ ও পুণ্য মনেতে, মন স্থির ব্রহ্মকর্মে হইলে উভয়ের অভাব, যে ভাব তাকে ভাবিলে আর কোনো ভাবনা কেন হইবে | কালকে সদা ধরে রাখিতে পারেন তো কালভয় কোথায় |”**

4. পরিশেষে:

জীবনের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজেকে বেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং বোদ্ধা মনে করায়- আশেপাশের ব্যক্তিদের আমি বেশ হীন দৃষ্টিতেই দেখে থাকি | যদিও দিনান্তে মিনিট পনেরো কুড়ির বেশি সময় আত্মকর্মের জন্য ব্যয় করি না, তবুও আমার মনে হয় গুরু ভাইয়েরা আমায় বিশেষ চোখে দেখেন এবং ভবিষ্যৎ পদটা আমিই পাবো | আর দিনান্তে আত্মসমীক্ষার জন্য ডায়েরি লেখা-“ধুর, সেসব তো ত্রুটিপূর্ণ ব্যক্তিদের জন্য, আমি ওসব কেন করতে যাব?” আমার এই ধরনের আত্মিক গর্ব বা দেমাকের পেছনে আসলে রয়েছে চরম মানসিক দৈন্য | এই দৈন্যকেই মানব মস্তিষ্ক দেমাকের আবরণে ঢেকে ফেলে এবং আমাকে যথার্থের, অর্থাৎ আমার প্রকৃত অবস্থার সম্মুখীন হতে দেয় না| কিন্তু এই ধরনের আবরণের একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে এটাকে চব্বিশ ঘন্টা ধরে রাখা যায় না; যখন যখন এই আবরণ খসে পড়ে, আমি আত্মসমীক্ষার চেষ্টা করি | কখনো মনে হয় আমিই সেই কালিবাবু, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার জন্য বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের প্রতি আমার বাসনার অন্ত নেই | কখনো বা নিজেকে গণিকা মনে হয় - যে যুগপৎ কামুক এবং লোলুপ | যদিও দীক্ষা দিবসে গুরুদেবকে কথা দিয়েছিলাম – “সর্বদা নীতিগত ভাবে চলবো”, তবুও নিজের কামুকতা এবং অর্থলোভ চরিতার্থ করার জন্য নীতির তোয়াক্কা আমি কোনদিনই করিনি | ভোগকে যেকোনো মূল্যে চরিতার্থ করাই আমার মূল লক্ষ্য | যখন অহংকারবশত অন্যদের সাথে দুর্ব্যবহার করি, অপমান করি, অন্যদের যাতনা দিয়ে, ছোট করে আনন্দ পাই, ক্ষুধার্ত পশুপাখিদের গায়ে ঢিল ছুঁড়ে মজা পাই, তখন নিজেকে অঙ্গুলিমাল এর মতো মনে হয়- যার মধ্যে আছে নিষ্ঠুরতা এবং পাশবিকতা; সহমর্মিতার লেশমাত্র নেই, যদিও গুরুদেবের ‘ক্রিয়াযোগ প্রসঙ্গে’ পড়ে জেনেছি সহমর্মিতা ক্রিয়াবানের অবশ্যই থাকা উচিত | সৃষ্টির আদিতে আমিও ব্রহ্মস্বরূপ ‘জগন্নাথ’ বা ‘মাধব’ রূপে ছিলাম, কিন্তু মহামায়ার ফাঁদে পড়ে সৃষ্টির চক্রে ঘুরতে ঘুরতে আমি আজ জগাই-মাধাই হয়ে উঠেছি | হেন পাপকর্ম নেই যা আমার দ্বারা হয়না এবং সেই অপরাধবোধ লুকাবার জন্য সর্বদাই থাকি অহংবোধের নেশায় মত্ত; পাছে নেশা কেটে গেলে বিবেকের দংশন আরম্ভ হয় | এত অবগুণ যার চিত্তকে গ্রাস করেছে, তার কি মুক্তি হবে প্রভু ?

প্রভু মোরে অবগুন চিত না ধরো |
সমদর্শী হৈ নাম তিহারো, চাহে তো পার করো ||
ইক লোহা পূজা মে রাখত, ইক ঘর বধিক পরো |
সৌ দুবিধা পারস নাহি জানত, কাঞ্চন করত খরো ||
ইক নদিয়া ইক নার কাহাওত, মইলো নীর ভরো |
জব মিল গয় তব এক বরণ হৈ, সুরসারি নাম পরো ||
তন মায়া জও ব্রহ্ম কাহাওত, সুর সু মিলি বিগরাও |
কৈ ইনকো নির্ধার কিজিয়ে, কৈ প্রন যাত টারো ||
----সুরদাস

হে প্রভু, আমার অবগুণ সমূহকে চিত্তে ধারণ করোনা, তুমি সমদর্শী সেই নামের কারণে আমায় উদ্ধার কর | এক ধরনের

লোহার উপকরণ পূজা স্থানে রাখা হয়, এবং দেবতার সেবায় লাগে; আবার এক ধরনের লোহা কসাইয়ের ঘরে পশু হত্যার কাজে লাগে | কিন্তু সমদর্শী পরশ পাথর ভেদাভেদ জানে না, সে দুই ধরনের লোহাকেই নিজের স্পর্শে বিশুদ্ধ সোনার রূপান্তরিত করে | নদীতে স্বচ্ছ জল থাকে, এবং নালায় দূষিত পঙ্কিল জল, উভয় জলই গঙ্গায় মিলিত হয়ে পবিত্র গঙ্গাজল হয়ে যায় | এই প্রকার শরীর মায়া এবং জীব ব্রহ্ম, কিন্তু মায়া'র সাথে মিশে সে কলুষিত হয়ে গেছে, কৃপা করে এদের পৃথক করে আমাকে এই মায়াজাল থেকে মুক্ত করো এই প্রার্থনাই তোমার চরণে করি |

------জয়গুরু

References:

1. অশোক কুমার চট্টোপাধ্যায়, "পুরান পুরুষ: যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী".

2. রজত গোপ, "মহযোগী পণ্ডিত পঞ্চানন ও তাঁর দিব্য জীবন".

3. স্বামী রাম, "তব অসীম রহস্য মাঝে".

4. শঙ্কর নাথ রায়, "ভারতের সাধক".

5. বৃন্দাবন দাস ঠাকুর, "চৈতন্য ভাগবত".

Kriya Yoga & Science – Part One

[Originally published in Bengali in ‘Anweshan’ January 2020 digital edition]

-Amitava Dutta

Translated in English by – Amit Chatterjee & Dipanjan Dey

We all know that the Sanskrit term ‘*vijñāna’(Science)* literally means ‘special knowledge’ about something. Grammatically, this meaning doesn’t possess any particular dependency upon specific subsection of knowledge. Yet, to our utter astonishment, we have developed the understanding of the term ‘science’ as the knowledge about some specific domains only.

Modern science teaches people to experimentally validate any developed theory or algorithm. However, we need to remember that the adapted experimental methodology and corresponding conclusive results generated in the laboratory initially originates in the human brain much earlier. That very idea motivates them to authenticate the theory or the idea in the later stage.

Life philosophy of ancient eastern civilizations inspires people towards deep thinking, to visualize the thoughts residing in the depths of the brain. As a result, by churning the mind, humans can extract the desired gems of knowledge. Using the same technique, ancient Indian sages have discovered versatile scientific aspects (e.g. concept of atom, motions of solar system, Heliocentrism, Sidereal periods, measurement systems, and many more) millenniums before the birth of modern science.

The magical powers of the human brain astonishes one. Utilization of only a fraction of that power leads to immense development in human being. Human brain, the most complex organ in human body, is made up with 100 billion nerves and trillions of connections. These nerve cells are distributed through spinal cord to the entire body in a net like structure. The highest density of neurons is observed in the brain, and then in the spine. This nervous system can be considered as the most priceless gem in the human body; hence, body protects it by the flesh and bone assembly.

According to physiology, spinal cord in the human body is formed by 33 interlocking bones; each bone is termed as vertebrae. These vertebras are used to retain the nerve fibres in spine and distribute them to the different parts of human body. Depending on the architecture, entire spine can be subdivided into 5 sections: coccyx, sacrum, lumbar, thoracic, and cervical.

The triangular arrangement of the bones with 4 vertebrae at the very bottom portion of spine is known as coccyx. Above the coccyx, there are five sacral vertebrae (S1 to S5), cumulatively making sacrum region. Next, there are 5 lumber vertebrae (L1 to L5), twelve thoracic vertebrae (T1 to T12), and 7 cervical vertebrae (C1 to C7), arranged in the bottom-up manner. Human brain is connected to the spine through first two cervical vertebrae viz. Atlas (C1) and Axis (C2).

The proximity of each junction region contains cluster of nerves, termed as plexus (‘chakra’ or ‘centers of life energy’). These clusters of nerves administer the function of associated body regions and different glands.

The *mūlādhāra chakra*, or *Brahma Granthi* resides in the coccyx region, just above the anus (the Sanskrit term '*granthi*' can be denoted as 'Knot'). In the junction between coccyx and sacrum, parallel to the reproductive organs, *svādhiṣṭhāna chakra* can be located. The *maṇipura chakra* can be located near the central region of lumber, parallel to naval. Parallel to the heart, *anāhata chakra* can be located in the central region of the thoracic. *Viśuddha chakra* can be located in the junction between thoracic and cervical, parallel to the throat region. Parallel to the junction of the eyebrows, in front of the pineal gland on the hypothalamus region, *ājñā chakra* or *kūṭastha* can be located. Next, *vrahmarandhra* can be located above the pallet and just outward of that point *sahasrāra chakra* or *vṛhada kūṭastha* can be located.

In *vimuktisopāna*, the locations of *ṣaṭcakra* (i.e.the six centers of life energy) are mentioned as:

guhyeliṅge tathā nābhau hṛdaye kaṇṭhadeśake **/**

bhrūmardhyahepi vijānīyāt ṣaṭcakrāntu kramāditi **//**

Meaning: The six chakras are in the centre of the eyebrows, throat, heart, naval, near reproductive organs, and anus regions, respectively.

These *ṣaṭcakras* are:

1. At the center of the forehead: *ājñā chakra*

2. In the throat region: *viśuddha chakra* (below the *ājñā chakra*)

3. In the heart region: *anāhata chakra* (below the *viśuddha chakra*)

4. In the naval region: *maṇipura chakra*(below the *anāhata chakra*)

5. In the reproductive region: *svādhiṣṭhāna chakra* (below the *maṇipura chakra*)

6. Near the anus: *mūlādhāra chakra*(below the *svādhiṣṭhāna chakra*)

The nerves connected to the spine in all the aforementioned chakras, can be contemplated as petals.

Utilizing the *Kriya pranayama* and *dhyana* techniques, it is possible to increase the efficacy of all the chakras. This eventually enhances the productivity of human body and helps the endocrine system to regulate the proper secretion of different hormones.

Each chakra regulates the hormonal secretion of specific glands and maintains the overall hormonal balance in human body. The associativity of glands with chakras is provided below:

1. *mūlādhāra chakra:* Adrenal gland or suprarenal gland

2. *svādhiṣṭhāna chakra:* Genital gland

3. *maṇipura chakra:* Pancreas and Spleen

4. *anāhata chakra:* Thymus

5. *viśuddha chakra:* Thyroid gland

6. *ājñā chakra:* Pituitary and pineal gland

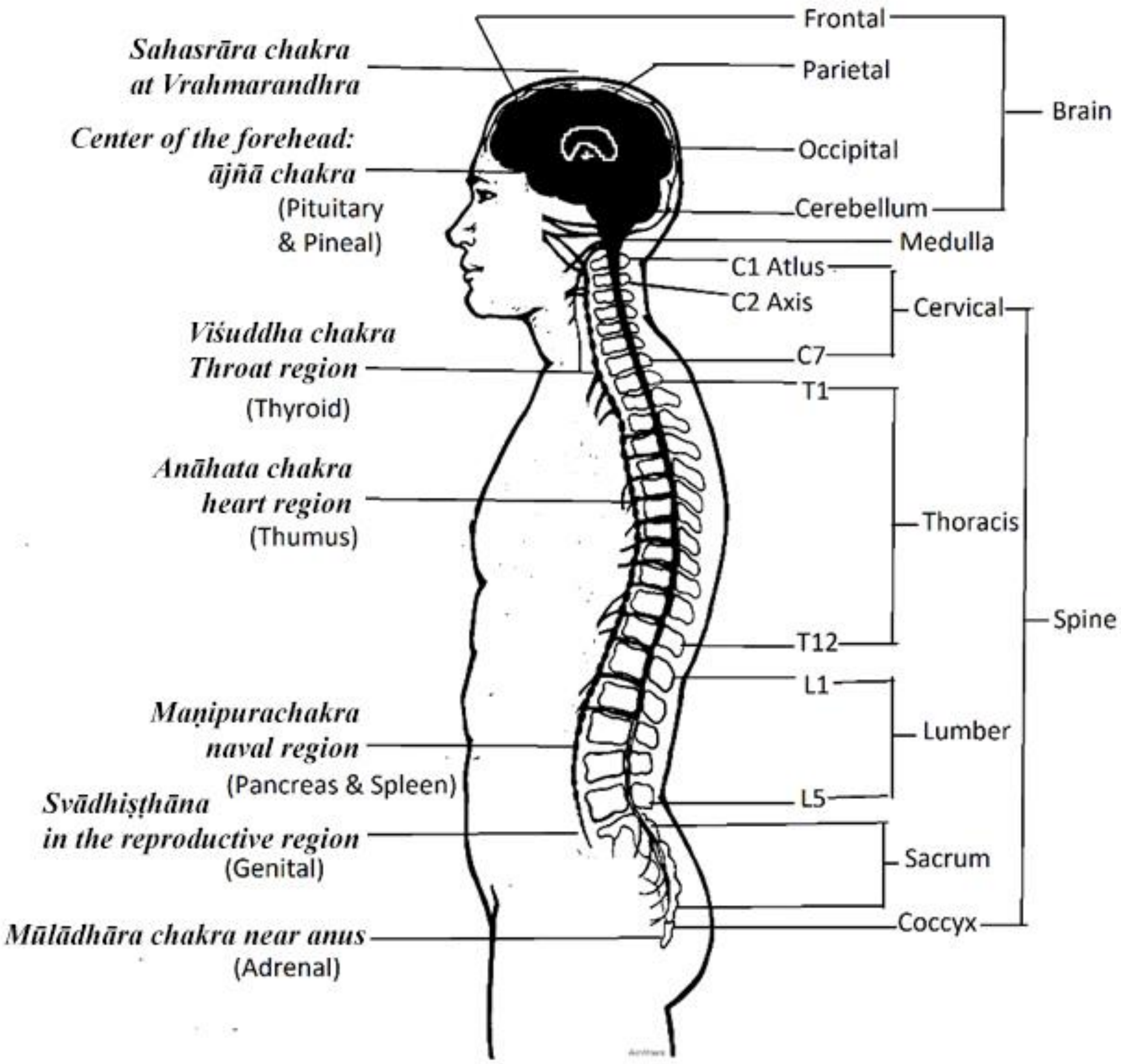
Sahasrāra chakra
at Vrahmarandhra
Center of the forehead:
ājñā chakra
(Pituitary
& Pineal)
Viśuddha chakra
Throat region
(Thyroid)
Anāhata chakra
heart region
(Thumus)
Maṇipurachakra
naval region
(Pancreas & Spleen)
Svādhiṣṭhāna
in the reproductive region
(Genital)
Mūlādhāra chakra near anus
(Adrenal)
Frontal
Parietal
Occipital
Cerebellum
Brain
Medulla
C1 Atlus
C2 Axis
Cervical
C7
T1
Thoracis
T12
L1
Lumber
L5
Sacrum
Coccyx
Spine

CHAKRAS (Plexus)

Location & Endocrine Glands

Location of chakras within the body and the corresponding glands

These five chakras in the spine also represent five *tattvas* (elements or principles of reality) that regulate different functions of human body. Mūlādhāra represents *kṣititattva* (earth element) that regulates the process of excretion (i.e. elimination of metabolic waste from human body). Svādhiṣṭhāna represents *jalatattva* (water element), that generate and regulate sexual fluids. Maṇipura represents *tejatattva* or *agnitattva* (fire element) that acts as digestion fire (also known as *vaiśvānaragni*) and produce energy from swallowed food. Anāhata represents *Maruta* or *Vayu Tatwa* (air element), and regulate the respiratory system. Lastly, Viśuddha represents *Vyoma* or *ākāśa tattva* (sky element), is the region of sound.

The *ājñā chakra* inside the human brain is *kūṭastha-ātmā-caitanya*, the point of pure consciousness. This regulates each aspect of human existence viz. body, memory (buddhi), intellect (manas), cosmic intelligence (chitta), sense of identity (ahankar), everything. *Sahasrāra chakra* or *vṛhada kūṭastha* resides above *ājñā*, where human consciousness is completely absorbed in *paramātmā* (supreme soul).

Gita explains that the battleground of Kurukṣetra (i.e. '*Dharmakṣetre Kurukṣetre*',*Ch1v1*) lies within this body (i.e. *idaṁ śharīraṁ kaunteya kṣhetram ityabhidhīyate, Ch13,v2*). These five chakras are *pandavas* - Sahadev, Nakul, Arjun, Bhim, and Yudhisthir; fighting eternally by the guidance of Krishna consciousness (of *'ājñā chakra'*) against hundred devilish tendencies (*'the Kauravas'*), and transforming the body towards divinity (*'Dharmakṣetra*).

By practicing kriya yoga technique with devotion in Guru's (the holy master) guidance, *pancha prana* (five vital life forces: *prana*, *apana, samana*, *udana*, *and vyana*) stabilizes; and higher state of consciousness can be accessed. Then the *pancha kosha* (i.e. the five sheath of body that covers the *atman or* soul) are penetrated, pure supreme energy is perceived, and body-matter duality is diminished. Human intellect is engrossed in the realization of *'sarbamkhalbidam brahma',* i.e. everything in this universe is brahma, and only brahma is the absolute reality (Chandogya Upanishad III.14.1). Millenniums after this assertion of Upanishad, similar concepts like wave particle duality (Louis de Broglie, 1924), wave-particle-energy conversion are being researched by modern science to understand exact nature of the universe. It is expected that, after extensive research efforts, the investigation by modern science in this direction will reach similar conclusions, in near future.

Mānasaputra – Part 2

(The Spiritual son)

[*Originally published in Bengali in 'Anweshan' January 2021 digital edition as a tribute to Shri Dubeyji*]

Regarding uninterrupted practice of the process obtained, we have learnt from Guru Ma about the overnight *sādhanā* of the two – the senior and the junior. The Yogi Guru started giving away all his knowledge obtained from *sādhanā*, and the disciple started assimilating everything – which is not very easy. The body-mind of the two householder yogis are, as if tied to the same tune; the disciple came up with the gradual steps of kriya and their correct procedures on his own – such is the unity.

It was a quiet night in a village named Shyampur, near Damodar based Pursura. Paramguru Dubeyji and Yogi Barindranath Das mahasaya started doing kriya, seated in a bed. Gradually, other disciples followed; as a result, the vibration of the entire room changed. At first, the disciple Sudhin kept himself busy looking for his bedding rather than sitting for kriya. But after observing other's kriya-pranayam, Sudhin also sat for kriya. Gradually the night moved from 2 p.m. to dawn, other disciples have completed their kriya, but Sudhin had not finished yet. After being called for a long time by his family nickname 'Gora', he opened his eyes. When asked by his Guru in private, he surprised him by saying about hearing intense sounds of bells and visions of stunning light, which is actually the vision of '*mahiṣāsuramardinī*' [the slayer of a demon named *mahiṣāsura*]. As a scientist whatever doubt he had in his mind, it ended that day. Das mahashaya silently looked towards Dubeyji, as if saying – 'didn't I say?' In answer Dubeyji's silent affectionate approval - 'precisely'. The young disciple was attracted towards kriya practice with his Gurudev in the deep solitudes of Gorakhpur.

In the transcendental state of a meditative mind, the disciple Sudhin experienced the subtle body one day – as if wandering across an endless ocean with a raft of white light. At this point, the disciple had the desire to see his Gurudev. Just in an instant, with his subtle body he reached from Kolkata to America, far off where his Guru Dubeyji was residing. He saw his Gurudev was sitting with a few disciples in front of him, and he was giving advice to the disciples. Upon enquiring about Gurudev's unwell state over the telephone, Dubeyji's strong injunction was – 'Have you understood what is *Vṛhada Kūṭastha*? If not, I shall not talk anymore on this'. This, coming unexpectedly from Dubeyji, resulted in a temporary feeling of detachment in the disciple for his Guru. Later in a meeting in Behala [kolkata], Dubeyji lovingly asked his disciple with a smile, 'Say, what do you have to say' and enquired – 'Have you understood the *Vṛhada Kūṭastha*?' regarding which, after a detailed discussion by the disciple about the special process of exiting from the [gross] body with the subtle body and then again re-entering it in a safe way, made him assured. Gurudev's instructions were – "these are the stages of *siddhi* or *siddhāi*, do not think of these and instead enjoy the bliss of the *Vṛhada Kūṭastha*, you will find the causal body there. That is the place of the *Puruṣottama*". The disciple's realization was – '*Vṛhada Kūṭastha* was not clear that day, now it is'. Later he remarks – "By the grace of Gurudev, when I reached the boundary of *Kūṭastha*, there was no more confusion that day as to what is *Vṛhada Kūṭastha*. That day I realized as if *Mahāmāyā* herself showed me the way onwards from that boundary". Upon hearing this, the Guru smiled with satisfaction and selected him as the one who would be entitled for giving Kriya initiation. Like this, gradually with the Guru's love, the disciple's *sādhanā* evolved. The duo's phases of love-affection and sensitiveness were unknown to others.

In this context, when the mind becomes subtle in the sixth kriya and thus becomes still, the sadhaka remains no more bound to the three *guṇas*. As a result of this kriya, the abilities of the subtle body and the process of separating the subtle body from the gross body comes under control. With this subtle body, one can go anywhere with a raft of light.

'*rathārūṛau vāmanaṃ dṛṣṭā*
punarjanma na vidyate'

– meaning the sadhak who has the vision of this [subtle] body is not reborn again. As long as this body exists, the cycle of birth & death continues. When this body reaches the *kāraṇa loka* [causal sphere], rebirth does not happen.

The disciple wakes up daily at dawn for *sādhanā*. If someday there is a little delay in waking up, an unknown touch is felt in the body. Upon saying this over the phone to the Guru – 'Will you not let me sleep also, wake me up?', hearing which the Guru's roaring laughter of joy knew no bounds. Likewise, the worthy kriyaban sadhakas have felt such attention and cooperation from the Guru. This is a perfect example regarding the sense of responsibility and love which a Guru has for a disciple.

The eminent sadhaka Dubeyji, although being a knower of the past, present and future by virtue of his power attained through sādhanā, allowed the destiny to manifest itself. Even during incoming of a danger in the family, he didn't attempt at making any change in the course of the destined. And he taught this to his worthy disciple too, who likewise uses his power of his *sādhanā* for the welfare of mankind.

Regarding lifestyle, Dubeyji had a very simple approach. His clothes were ordinary and he was indifferent towards his diet. But he was very attentive towards his disciples. When disciples were to come to his house at Gorakhpur, he even used to clean the toilet himself – as Christ himself washed the feet of his disciples once. He was also the least worried about his body and its care. Even when he travelled to distant villages for giving initiation, in chilling winter also, he used to take bath in cold water from the well. When asked about any inconvenience or difficulty, he used to answer – 'everything is fine'. He had no special longing regarding any particular food. At his home, although his wife used to serve different types of dishes beside rice, Dubeyji used to eat as if hopping from one item to another, like a small kid. At his disciple Sudhin's house, he used to like his wife's cooking and used to say that the diet of a Yogi should be like this. Whenever he went to any disciple's house for the betterment of kriya practice, he made sure everyone was diligent about their practice.

He used to say that for kriya, no special arrangements are needed separately; a tiny corner of the bathroom is enough. Along with Kriya practice if there is unity of mind, then the proper environment and situation required for Kriya practice manifests on its own. Contextually, despite the long distance between the disciple Sudhin's home and workplace, and other obstacles, the proper place, time and surroundings for his kriya practice always occured. Regarding Kriya yoga, Dubeyji has said – 'The main goal of kriya is to make the mind enter in the kūṭastha'. In reality the disciple gets the power of meditative mind from the communion with '*Guruśakti*'.

Kriya was Dubeyji's only goal – even once, while travelling in a bus, he recognized proper potential in a person and told him to meet and later initiated him in Kriya. Even after retiring from work life, for the purpose of proper dissemination of Kriya, he used to travel to different places from Gorakhpur, Uttar Pradesh. According to their potential, communion, and wish/desire, ParamGuru used to observe every disciple from distant Gorakhpur, looked after their ascent in Kriya and provided the necessary help needed. Through his inner vision, Dubeyji understood the measure of accuracy in the Kriya practice of the disciple by just having a mere glance and according to potential, advised and guided them. When asked about ones' own kriya practice, he remarked with dual meaning, 'Well, fine'. According to their own state and condition, they understood the right meaning intended. He used to say – "Those who have given me the authority over them or want my advice, I always keep communion with them on my own accord".

The Gita says –

'ye yathā māṁ prapadyante tāns tathaiva bhajāmyaham

mama vartmānuvartante manuṣhyāḥ pārtha sarvaśhaḥ' *(Chapter 4, Verse 11)*

Meaning – 'One who surrenders unto me in whatever way, I reciprocate accordingly. Everyone follows my path in all respects'. The wife of a certain Kriyaban looked Dubeyji as *Gopāla*, the child form of Krishna, and Dubeyji used to greet her accordingly.

The year was 1988/89; Dubeyji was at the *Pūrṇa kumbha*, at Allahabad. Three of the disciples went to the *kumbha mela* to accompany their Gurudev. In that vast area, seeing no scope of meeting the Guru, they were about to return back; when they met a sadhu who showed them the proper way leading them to Gurudev's tent. Their inherent love for their Guru led the disciples to their desired place by a Divine power. According to the disciples, he was Babaji Maharaj. During discussion, Sudhin enquired – 'Was he Babaji or Gurudev himself?' in response, Dubeyji only smiled mysteriously.

Once ParamGuru Dubeyji had to catch a train and had reached the station on time and even settled himself; however, a disciple who wanted to travel along with him had not reached yet. The time arrived for the train's departure, and even the whistle blew for the engine start, but nowhere was the disciple. On the other hand after a little shake for a while, the train didn't move further. Even after several attempts by the driver and engineers, the train didn't move. After a while, the disciple was seen approaching the platform from a distance, running. As soon as he climbed the train, all of a sudden, the train gave a little shake and started moving. The disciple saw Dubeyji was sweating buckets, and was wiping it off with a towel. Such compassion for a disciple is rarely found. Being completely aware about his earthly departure (16/07/2004; Bengali 31st of *Āṣāṛa*, 1411), the great yogi Dubeyji, overcome by other's grief, even took the fatal disease of a person in his own body.

The Param Guru was himself a walking encyclopedia of the Gita and the Vedas. Essence of various Holy Scriptures and yogic explanations can be found in his book 'Kriya Yoga Rahasya' [*transl. 'The Secret of Kriya Yoga'*], which is perhaps one of the most authentic works regarding the practice of Kriya yoga. Walking the same path, his worthy disciple has also given different explanations of the scriptures in the light of Kriya, in his book 'Adhyatmikta, Kriyayoga and Atmabodha'. Other than this, the published version of various interactions of his disciples with him in question answer format in 'Kriya yoga Prasange' guides the way for Kriyabans.

In the worldly perspective, Dubeyji finished his education from the Vidyasagar College, and due to his father's retirement, joined the office of a famous shipping company of the Calcutta Port Trust, located in Park Street area. He used to live in the Jorabagan area of Nimtala. For uninterrupted practice of Kriya, he particularly utilized the weekend's time. Either after the office hours on Friday evening or from Saturday morning, upto Monday morning- except very essential work - he practiced Kriya uninterruptedly. At his Gorakhpur residence also, Dubeyji used to stay nearly aloof in a separate small room and remain immersed in Kriya.

In the same manner, the scientist disciple stayed far away from his workplace SSKM Medical College Hospital in Kolkata, at his residence in Uttarpara, Hoogly. Waking up at night at three, he used to sit for his *Ātmakarma*. After a long while, taking just a little food, he had to run to catch the train for his work. After returning from work, again by train, he took a little food and sat for his *Ātmakarma* again. Up again after a long while, taking a little food for dinner, the time came for his rest. This was his daily routine.

Paramguru Dubeyji and his disciple Barindranath Das Mahashay have come to the Uttarpara residence. After night long Kriya *sādhanā*, the next day as Das Mahashay sat on the bed, he got up immediately and asked – 'who practices Kriya in this place?' and after Sudhin's response in affirmative, he exclaimed – 'what an extraordinary vibration! One cannot get this perhaps even in the Himalayas!' to which Dubeyji said – 'so, do you understand now? Why I keep wishing to come here?'. Whenever his beloved disciple Sudhin wanted to touch his feet, Dubeyji used to embrace him instead.

Amongst the worldly events in Sudhin's life, many miraculous events occurred as well. Paramguru used to question affectionately about all those events and he used to get a particular joy listening them from his disciple's mouth. Paramguru had a loving attitude, immense compassion, but he also had immense vigor.

When Paramguru used to come and stay at the Uttarpara residence of Sudhin, his other disciples also arrived and they mostly did night long *sādhanā*. Along with his wife, the disciple Sudhin kept himself busy attending them. Only after *sādhanā* when everyone left and the night was over, did he get the time to speak with Dubeyji in solitude.

Once while returning home from work, a doubt arose in Sudhin's mind – 'Now that Gurudev is staying in my house, many disciples are coming and he is preaching them as well; but being a student of science, as a scientist, how come I have become engaged in all of this?' No sooner had he entered, Dubeyji directly asked Sudhin – "Did I do something wrong?" Sudhin was awestruck – 'How come he knows what I was thinking?' Whatever little doubt he had in his mind had ended – now total surrender came for the Guru.

In this way, Sudhin's *sādhanā* continued. Paramguru kept visiting the Uttarpara residence, the disciples came, night long *sādhanā* ensued. On the other hand, in the morning, work at the hospital followed. This left no time for conversation with the Guru in a little isolation. The desire to show the Kriya process and to discuss about the experiences was increasing with time, but no opportunity arose. Time came for Dubeyji to leave now, and the car left with Paramguru. Getting ready for his office, the disciple kept regretting – no opportunity came to show the Kriya and discuss the experiences. Then suddenly the bell rang. Opening the door, he saw Gurudev had returned back with the car. Upon questioning, Dubeyji said – 'You only didn't let me go; now, say what do you have to say'. The disciple now sat to show the kriya. Paramguru asked – 'Did you wanted to show this one?' the disciple answered – 'No, I wanted to show a different one, this happened just now'. Then after watching the other kriya, the Paramguru being at once surprised and happy, said – 'that which you showed at first is the third kriya, and the next one, second kriya'. Later he got the fourth kriya from Dubeyji.

Along with kriya practice, his scientific inquisitive mind continued to seek the science behind these processes. Gurudev Dubeyji used to say – "God seeks for good intellect; with a good intellect, *svādhyāy* is understood". Once during an isolated discussion, Sudhin said to his Gurudev – "The different stages of this kriya has already been stated by science in its own language". When questioned by the Guru, he went upto the bookshelf and took a book on Genetics and then citing the DNA structure, explained the fifth, sixth, seventh and eighth kriyas and the respective science behind these to his Guru. Immensely surprised, Paramguru Dubeyji after listening all this was amazed and thus blessed with affection – 'Verily you have done it previously (before this life), and hence you could say everything, otherwise it is not possible for others to say these things'.

Contextually, Shri Maheswari Prasad Dubeyji had got kriya initiation from his Guru Shri Nitai Charan Bandopadhyay Mahasaya, when he was in his college and by the sheer power of his *sādhanā*, had been authorized for kriya initiation just after the second kriya.

Sudhin, the worthy disciple of Paramguru, started kriya practice since 1992 and within only seven years had accomplished all the seventeen kriyas - the principal seven kriyas along with the Dhyana kriyas. Dubeyji wanted Sudhin to give Kriya initiation, but the disciple remained immersed in his *sādhanā*. When questioned by Sudhin, Guru Dubeyji informed that he has in himself that (required) state of equilibrium. The one, who is in communion with the universal mind and universal love, is verily the Guru. Once even Paramguru's elder daughter-in-law said to Sudhin – "At home my Father-in-law always speaks about you; please agree for performing initiation". At the requests of Barindranath Das Mahashay and few other disciples, Sudhin finally agreed for initiation. The great yogi Dubeyji ordered his worthy disciple to perform kriya initiation.

About the duality of mind regarding giving kriya initiation, Sudhin said later – "At that moment while giving the kriya initiation, it was as if Gurudev made me see the entire eighteen chapters of the Gita at once- that O Arjuna! Watch, for you know nothing. See what you have to do. Thus, I was obliged to prepare for giving Kriya."

Finally Paramguru Dubeyji at the presence of his elder daughter-in-law and few other worthy disciples performed that special ritual and celestial work – flowing of the *Guruśakti* – thus transferring the energy to Sudhin.

Regarding this Dubeyji has said – 'Without the knowledge of *Guruśakti,* one cannot become a Kriyayoga initiator. Influenced by the Guru's *śakti,* one can be made to see the vision of Kūṭastha (opening of the third eye)'. Further he said – "While making one see the Kūṭastha during Kriya initiation, the seeker's receptive power is to be judged. During this period, a process of exchange occurs between the Guru and the disciple. Taking light [energy] particle from inside the subtle body of the receiver, endow it with consciousness, energize it and return it back to the receptor's body". During Kriya initiation, while the amount of consciousness transferred is uniform, the transfer of energy is done according to the seeker's receptive capacity.

What a magnificent scene! – The disciple Sudhin is touching his first disciple's Kūṭastha, and opening the *Upanayan* [third eye], and the great yogi Guru sitting just behind him touching his disciple and the future Guru, thus ensuring the flow of *Guruśakti*. If this energy manifests while giving Kriya, only then the eligibility to give Kriya is attained. Due to the Guru's touch, a new world is manifesting in front of the disciple too; he is himself surprised – 'How is this possible? I have not performed kriya initiation before, how am I giving Kriya now?' After initiation, the Guru's blessings were –"You have performed very good Kriya initiation" and along with that he gave his reassurance – "You verily have given kriya before [this birth]". After this Kriya initiation, from this very instant, the worthy and thus beloved disciple of the great yogi is also a Guru – Acharya Shri Sudhin Ray.

By the virtue of his receptive power, communion, and firm resolve for *sādhanā*, the disciple Sudhin thus became the great yogi Dubeyji's '***ātmaja***'. Nothing more remained further to be given. Paramguru Yogacharya Shri Shri Maheswari Prasad Dubeyji thus gave the authority of initiation to his ***Mānasaputra***, Acharya Dr. Shri Sudhin Ray, and ensured the continuity of the pure Kriya path and the flow of *Guruśakti*, hence making successor of his auspicious power obtained from *sādhanā*, and bestowing us all with grace.

ॐ tasmai śrī gurave namaḥ

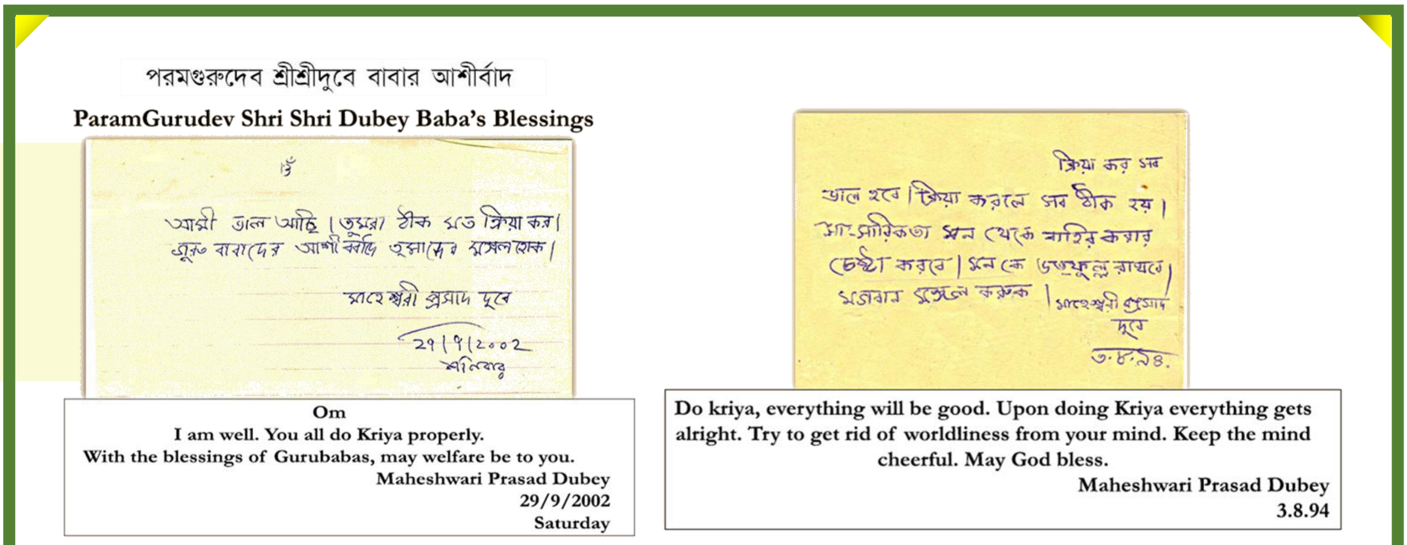

পরমগুরুদেব শ্রীশ্রীদুবে বাবার আশীর্বাদ

ParamGurudev Shri Shri Dubey Baba's Blessings

ওঁ

আমী ভাল আছি। তুমরা ঠীক মত ক্রিয়া কর।
গুরু বাবাদের আশীর্ব্বাদে তুমাদের মঙ্গল হোক।

মাহেশ্বরী প্রসাদ দুবে

২৯।৯।২০০২
শনিবার

Om
I am well. You all do Kriya properly.
With the blessings of Gurubabas, may welfare be to you.
Maheshwari Prasad Dubey
29/9/2002
Saturday

ক্রিয়া কর সব
ভাল হবে। ক্রিয়া করলে সব ঠীক হয়।
সাংসারিকতা মন থেকে বাহির করার
চেষ্টা করবে। মনকে প্রফুল্ল রাখবে।
ভগবান মঙ্গল করুক। মাহেশ্বরী প্রসাদ
দুবে
৩.৮.৯৪.

Do kriya, everything will be good. Upon doing Kriya everything gets alright. Try to get rid of worldliness from your mind. Keep the mind cheerful. May God bless.
Maheshwari Prasad Dubey
3.8.94

(Paramguru Dubeyji's handwritten letter to his disciples)

References:

Discourses and discussions by Gurudev and Guru Ma,

Discussions with Guru Brothers and Sisters,

Above all the knowledge obtained from the books written by Gurudev and Paramguru.

বীর বিবেকানন্দ

- পামেলা মুখোপাধ্যায়

বীর জানি যুদ্ধ করে শিরস্ত্রাণ সাথে,
বীর জানি যুদ্ধ করে তলোয়ার হাতে।
বীর জানি যুদ্ধ করে বাহুবলের জোরে,
বীর জানি যুদ্ধ করে রক্তক্ষয় করে।

বীর তুমি, তবু নেই শিরস্ত্রাণ মাথায়
মহাদেবের জটা সম পাগড়ি শোভা পায়।
বীর তুমি যুদ্ধ করো বাক্য তলোয়ারে
শানিত যুক্তির ফলা মনকে মুক্ত করে।

শূন্য হাতে, লক্ষ্য অভয় কোটি জনে বিলাও
অজ্ঞানতার অন্ধকারে বিবেকের আলো জ্বালাও।
জিতেছ জ্ঞান যুদ্ধে , পেয়েছ সম্মান
সন্যাসী হয়েও বীর, লহো গো প্রণাম।।

না বলা কথা

- সঞ্জীব কুমার দাস

সর্বপ্রথম বাবা আপনাকে এবং গুরুমাকে আমার আন্তরিক প্রণাম জানাই। পৃথিবীতে ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। ‘মান’ এবং ‘হুঁশ’এর সমষ্টি। আজ অজানা জীবাণুর সংক্রমণে এই পৃথিবীর সমগ্র মানুষের মান এবং হুঁশ এর ছন্নছাড়া অবস্থা।

কোভিড ১৯ সংক্রমণের জন্য লকডাউনের প্রথম দুই/তিন দিন দৈনন্দিন কাজের পর টিভির পর্দায় মনোনিবেশ করা ছাড়া আর কিছু কাজ ছিল না। মন বিক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য টিভি দেখা বন্ধ করলাম। ঘরে থেকে দৈনন্দিন কাজ করে মনোনিবেশ করলাম গুরুদেবের দেখানো পথে। কারণ এই অফুরন্ত মূল্যবান সময় হয়ত এই জীবনে আর পাবো না।

গুরুদেবের নির্দেশ পেলাম প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টার সময়ে ক্রিয়াতে বসার। নির্দেশ পাওয়ার প্রথম দিন থেকেই শুরু হল মানবজাতির শান্তি কামনায় আত্মকর্ম। প্রতিদিন ক্রিয়া অর্থাৎ আত্মকর্ম করার সময় অনুধাবন করলাম, “গুরু কৃপাহি কেবলম্” কথাটির অর্থ। গুরুকৃপা মানেই আনন্দ সাগরে ভেসে যাওয়া। স্বপ্নে দেখা কোনও দৃশ্য বা কোনও উপলব্ধি সাময়িক সময়ের জন্য মনে থাকে। ঘুম ভাঙলেই আর কিছু মনে থাকেনা। এই কদিন সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নের মত যা কিছু উপলব্ধি হল, এই জীবনে তা ভুলবার নয়।

লকডাউনের মধ্যে একদিন গুরুদেবকে ফোন করে উপলব্ধির কথা জানাতে গুরুদেব লিখে রাখতে বলেছিলেন। সমগ্র অংশ বিশেষের মধ্যে আংশিক লিখলাম; কারণ, সমগ্র অংশ লিখতে গেলে একটি ডায়রি শেষ হবে। ভক্তি বা বিশ্বাস যাই বলা হোক না কেন, জানি, যে সমগ্র উপলব্ধির দর্শন ও মনন গুরুদেবের অবগত।

নাভিক্রিয়া করার সময় পদ্মফুলের অসাধারণ সুবাস অনুভব করি। প্রাণায়ামের সময় ওঙ্কারধ্বনি এবং ডান কানে ঝিঁঝিঁ পোকার জোর চিৎকার শুনতে পাই। দিনের যেকোনো সময় একান্তে থাকলে প্রাণায়াম করার সময় যে অনুভূতি, সেই অনুভূতি এবং আনন্দের রেশ থাকে। সমস্ত শরীর এক ভাইব্রেশন বা কম্পনের মধ্যে থাকে। অনেকটা বাসের ইঞ্জিনের পাশে সিটে বসার মত।

জ্যোতিমুদ্রা করার শেষ পর্যায়ে একটি আলোর বিন্দু (তারার আকারে) দর্শন। বিন্দু চলে গেলে এক উজ্জ্বল সাদা আলোর বলয় দৃশ্যমান হয়। বলয়ের মাঝের অংশ কিছুদিন অন্তর রূপ পালটায়।

১) সাদা বলয়ের মাঝে ঘন নীল, নীলের মাঝে একটি ছোট বৃত্ত।

২) সাদা বলয়ের মাঝে সবুজ রঙের প্রতিচ্ছবি। চিন্তন মননেও রং পালটায় না, কিছুদিন এইরূপ দর্শন।

৩) প্রথমে এক আলোর বিন্দু, শেষ পর্যায়ে একটি আগুনের বলয়ের মাঝে একটি চক্র, চক্রটি ঘূর্ণায়মান।

৪) আলোর বিন্দুর পর এক ঘন কালো অসীম আকাশের ন্যায়, যার সীমা পরিসীমা নেই। এক একটি উপলব্ধি কিছুদিনের জন্য থাকে। ঠিক প্রকাশ করতে পারলাম কিনা জানিনা, লাহিড়ী বাবার বইতে পড়েছি, মন দিয়ে ক্রিয়া সাধনা করলে প্রথম ক্রিয়াতেই সব পাওয়া যায়। আমার স্থির বিশ্বাস, প্রতিদিন ক্রিয়া সাধনা অভ্যাস করলে প্রত্যেক ক্রিয়াবানের নানা রকম উপলব্ধি হবেই। একথা সর্বাংশে সত্য।

পরিশেষে বলি, কর্মজগতে আবার প্রবেশ করেছি, কিন্তু জগতটা আছে, কর্ম নেই। একমাত্র সত্য আত্মকর্ম। জগৎ আছে কারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দিন সকালে বাড়ির পাশে প্রতিদিনের মত চড়াই, বুলবুলির ডাক শুনেছি; দুর্যোগের পরের দিনও একই ভাবে পাখির ডাক শুনতে পাই। জীব জন্তুদের কাছে প্রাকৃতিক দূর্যোগ আলাদা কোনও মাত্রা বহন করে না ।

গুরুদেবের শ্রীচরনে প্রণাম জানিয়ে শেষ করলাম।

“গুরু কৃপাহি কেবলম্”

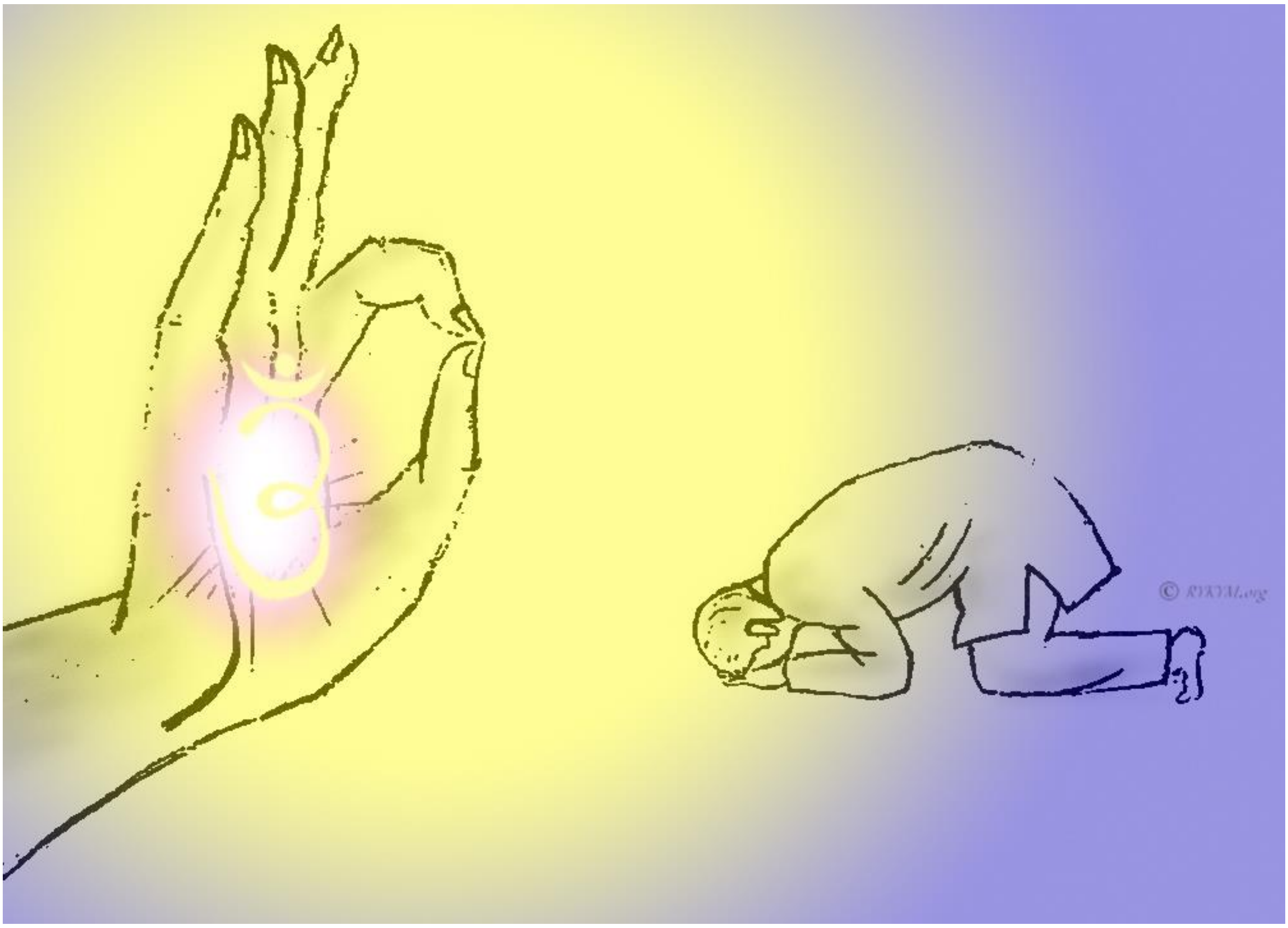

Drops of Nectar

(From Sri Sri Ramakrishna Kathamrita)

– Sudeep Chakravarty

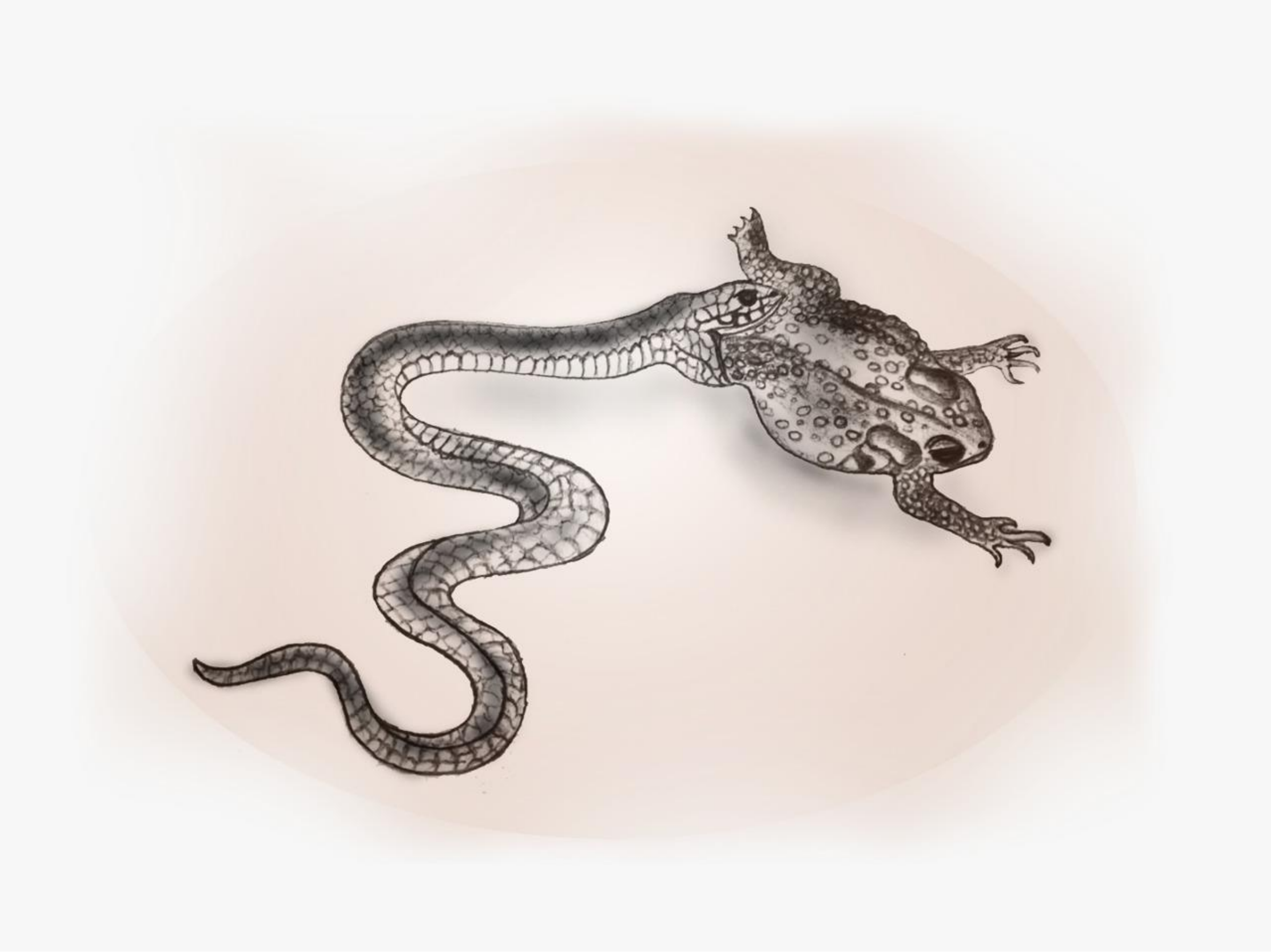

Once upon a time, Shri Ram Krishna Paramahansa was going to Ganga Ghat via Panchvati Udyan (garden). Suddenly he heard a creature moaning from the nearby bushes. Going closer, he saw that a water snake was trying to swallow a bull frog, but the frog was too big for the snake's food, due to which the snake was unable to swallow it, and the frog was stuck in between. We do not get to know of what happened to that snake and frog in Sri Sri Ramakrishna Kathamrita, but Shri Rama Krishna has given a very relevant example of this incident.

He compared the water snake to an incompetent master, and the bull frog to an immature disciple. Ramakrishna says that If there were a cobra snake in place of this water snake, then the salvation of this bull frog was certain with a single bite itself. The cobra is the Satguru, who takes the burden of the disciple's Karma on his shoulders and paves the way for the disciple's liberation. On the other hand, an incompetent master (water snake) who is himself ignorant, pushes the disciple into a greater darkness.

It's a matter of great fortune for any person to have a competent Master or Satguru in his/her life. We do not know that after the accumulation of how many births' good karma makes us worthy of the company of a Sadguru. How fortunate are those Kriyavans who have received initiation from our Gurudev!

Hindi Translation

एक बार की बात है, श्री राम कृष्ण परमहंस पंचवटी होकर गंगा घाट की ओर जा रहे थे| तभी उन्हें पास की झाड़ियों से किसी जीव के कराहने की आवाज सुनाई दी| पास जाकर उन्होंने देखा कि एक जलसर्प एक बड़े मेढ़क को निगलने का प्रयास कर रहा है, पर मेढ़क सांप के आहार के लिए काफी बड़ा है जिस कारण वो उसे निगल नहीं पा रहा है और मेढ़क दर्द से चिल्ला रहा है| उस सांप और मेढ़क की क्या परिणति होती है इसका उल्लेख हमें कथामृत में नहीं मिलता है, परन्तु इस घटना का बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण श्री राम कृष्ण ने दिया है| उन्होंने जलसर्प की तुलना अयोग्य गुरु ,और मेढ़क की तुलना अपरिपक्व शिष्य से किया है| श्री रामकृष्ण कहते हैं कि इस जलसर्प की जगह अगर कोबरा नाग होता तो एक ही दंश से इस मेढ़क की मुक्ति निश्चित थी| कोबरा सत्गुरु है जो शिष्य के कर्मों का बोझ अपने सिर लेकर शिष्य की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है| वहीं दूसरी तरफ अयोग्य गुरु (जलसर्प) जो स्वयं अज्ञानी है, शिष्य को भी गहन अंधकार में धकेल देता है|

सद्गुरु का जीवन में प्रादुर्भाव होना किसी भी व्यक्ति के लिए सौभाग्य की बात है | पता नहीं कितने जन्मो के पुण्य फलित होने पर सद्गुरु का सन्निध्य प्राप्त होता है | इसलिए वह क्रियावान भाग्यशाली है जिन्होंने गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त किया है|

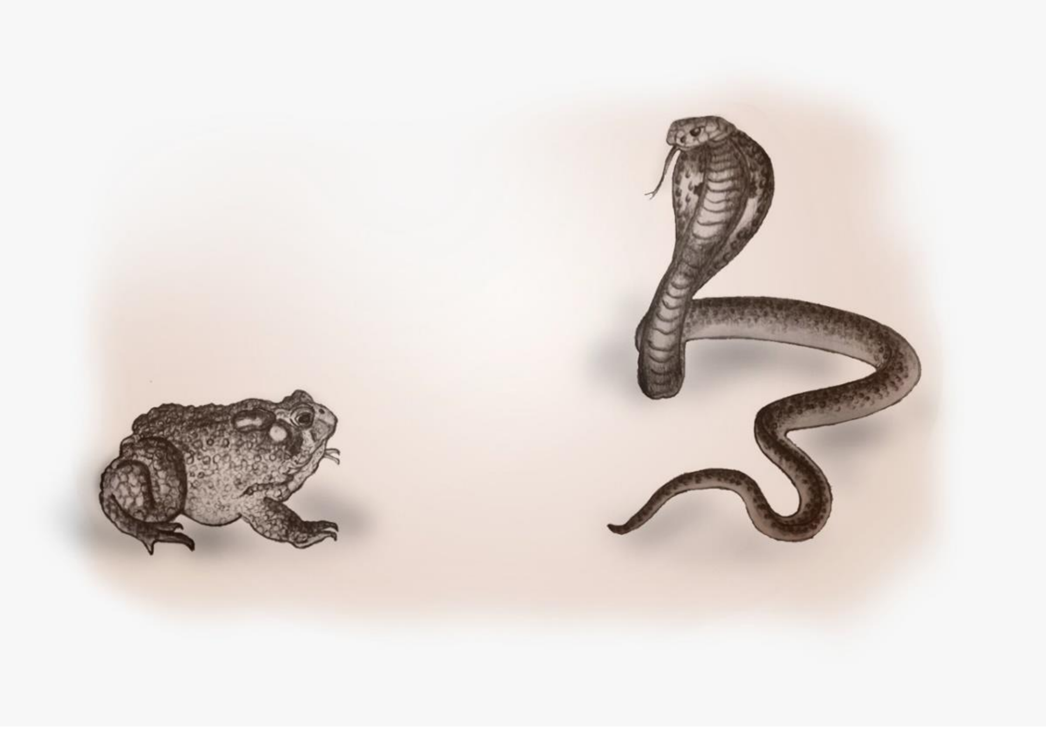

The Movement of Hurt

– Saket Shrivastava

Why do we get hurt? What is that which really gets hurt? Getting hurt can be perceived from two dimensions, viz. physical and psychological, while there may be still a combination of both. As far as physical pain is concerned, it is not deep but superficial, and therefore can be handled in a much easier way. However, the psychological ache is damaging as it is deeply rooted into the psyche of man and therefore takes time to subside. Now what is that which really gets hurt?

As pointed out by the Master, **it is our ego that gets hurt**. And what that ego really is? So far, this author has realized that our ego is but collection of images that we develop in due course of our lives, while perceiving such images to be real. No wonder, we thus keep inflating the ego continuously. But why do we call them images? It is so because if we observe closely, we shall find that all that we accumulate around ourselves, except tangibles, are only in imaginations, the latter being the byproduct of our thoughts. Such images though not actually real, appear to be so because of our severe attachment to them. Such images that we form about ourselves are temporary, as they keep changing, though we may not be aware of such changes that swiftly take place due to our ever-restless mind (gross). So it may be stated that formation of images about oneself is the handicraft of the restless mind (gross).

But is it true that only the image gets hurt and not the actual ‘I’? Otherwise, why is that one suffers so badly on being hurt. Perhaps its answer is rooted in our deep-seated attachment with images that causes the actual ‘I’ getting lost and replaced by the ‘I’ built up with images, accumulated over time which is unreal. That which gets hurt is this unreal ‘I’, which ignorantly is considered the real ‘I’. No wonder our sufferings don't stop, as the unreal ‘I’ being accumulation of images, is gratified regularly by addition of more images. Whenever any image is attacked or challenged, the delicately nurtured unreal ‘I’ gets hurt instantly. Images that inflate our ego, such as, a high position in the society, appreciation, praise, power, reputation, prestige, fame, etc. lead to strong attachments to them, in comparison to any negative image about oneself. It is a fact that man religiously tries to build an image that's acceptable to society, irrespective of whether he indulges in activities morally acceptable to society or not. Such a positive image is then nurtured continuously by imagining and glorifying the good deeds etc. done by him in the physical world. That positive image receives a jolt when it is challenged or belittled by someone known or strange. Since such an image is built with hard work over a sufficiently long period in the psychical world, man gets immensely attached with it, and therefore guards it enviously. Even the slightest attack on such an image sends him in a dizzy. However, the sad part is that man is hardly aware of this.

Till it was pointed out by the Master, I too had the false notion that it is ‘he’ who gets hurt, whereas actually it’s his image that generally gets hurt, else, it would never have been possible to cope up with such wound repeatedly. One of the most dreaded forms of emotional pain that I witnessed was the pain caused to the parents who lost their only adult son. Such a pain is unimaginable and difficult to be explained from the logic of image. However, if we ponder over it we will understand that the very relationship between parents and a child and all other relationships in this world alike are nothing but images. When a child is born he is hardly into any relationship for he understands none. In fact, he does not even recognize his mother but remains attached to her only for food in the initial stage of his upbringing. It is only gradually that the child develops an affinity for his parents due to an overload of affection. Over a period, the bonding between a child and his parents reaches such height that it becomes impossible to imagine the existence of one in the absence of the other. However, such bonding is still an image as it would not wither in the absence of one another.

To conclude, unless one understands the true self and stops considering his delicately pampered ego as the true self, there is no respite from being hurt. This true self or the realization of ‘I am’ comes only when the **thought is not** for ‘I am’ is the real- perceivable only in this very moment or ‘here and now’ and vanishing no sooner mind comes into play for mind exists only in past and future and remains nonexistent in this very moment or ‘here and now’ **when time comes to a stop** (a matter of pure realization and therefore non explainable any further). Upon realization of ‘I’ in the conscious state (as it is present in deep sleep and unconscious state as well) that is ever present and eternal, all images shall drop automatically without effort, and then such ‘I’ can never be hurt. However due to images that we unfortunately get entangled into due to our materialistic way of life, we somehow get lost and lose touch of the real ‘I’. We just keep basking in the superficial images thinking them to be real, only to realize their non-permanence, when some external onslaught shatters them. In the state of 'no mind', there is a possibility of not getting hurt. As long as the mind is there, thinking, imaginations, and images will be there. Such a gross mind will never allow one to understand one’s true nature, that alone is constant and eternal, and is always with him, irrespective of whether he realizes it or not. I bow down before the realized masters who made us understand such great truth in this life.

শিবভূমি ভীমাশংকর

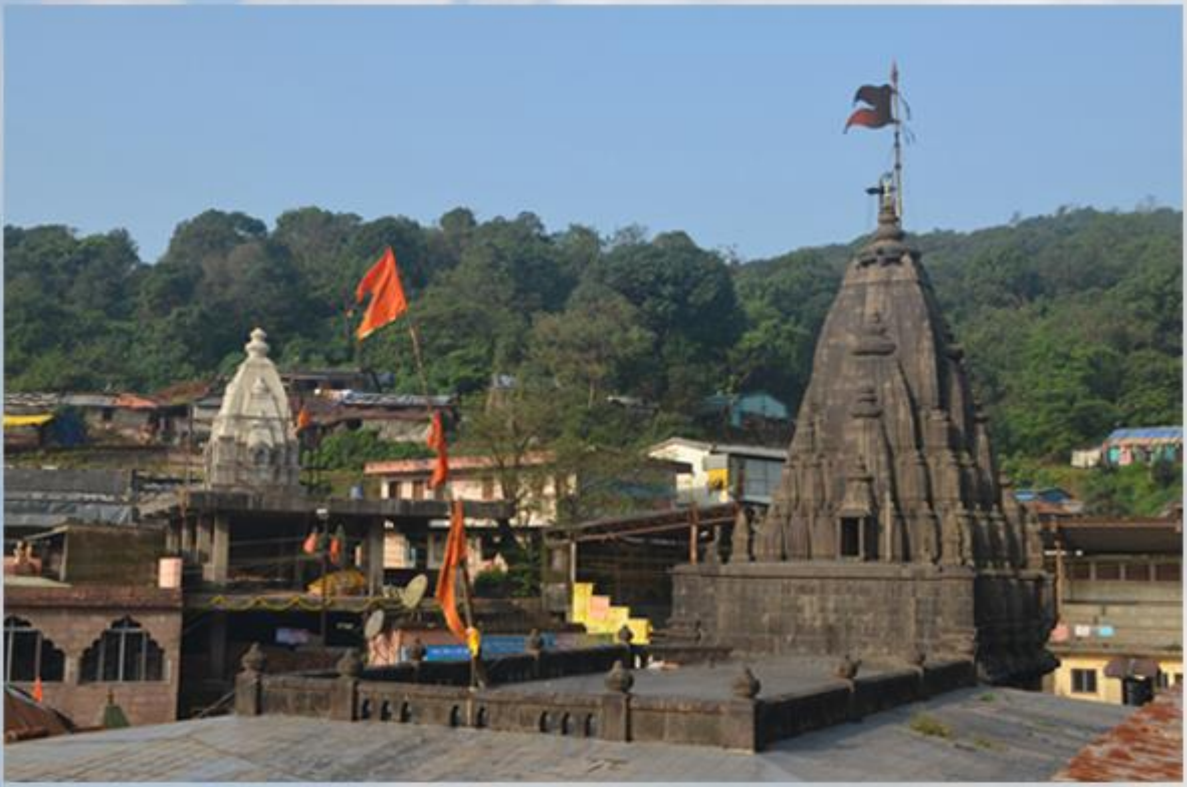

- সৌমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

‘অন্বেষণ পত্রিকায় একটা লেখা জমা দিতে হবে’ গুরুভাইরা আমাকে হঠাৎ একদিন এই আব্দার করে বসলেন। আমি তো খুব বিড়ম্বনায় পড়লাম, কারণ আমি কোন লেখক নই, আবার উচ্চ অভিজ্ঞতাসম্পন্নও নই যে ক্রিয়া সম্বন্ধে কোন লেখা চটজলদি লিখে ফেলতে পারব। এরকম সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনের মধ্যে একটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো - ভ্রমণকাহিনী। তবে যেকোনো ভ্রমণকাহিনী তো দেওয়া যাবে না, তা যদি হয় কোন আধ্যাত্মিক স্থানের, যেখানে একাধারে পাওয়া যাবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের ছোঁয়া, আবার সেই সঙ্গে এক সুগভীর ঐশ্বরিক অনুভূতি। স্মৃতির মণিকোঠায় এরকম অনেক ভ্রমণ বৃত্তান্ত ভেসে উঠলো। ঈশ্বরের কৃপায় আমি সুযোগ পেয়েছি অনেক দুর্গম মরু কান্তার পর্বত পেরিয়ে সেইসব নির্জন প্রকৃতির কোলে পৌঁছে যাওয়ার, যেখানে মন প্রাণ জুড়িয়ে গেছে কোমল প্রকৃতির স্পর্শে, আবার মন প্রাণের সমৃদ্ধি ঘটেছে এক চিরন্তন আনন্দের অনাবিল আধ্যাত্মিক চেতনার মধ্যে।

সময়টা ছিল ২০১২ সালের অক্টোবর মাস। দুর্গাপুজোর আর বেশি দেরি নেই; ভাবলাম, এই বছর কি পুজোর সময় কোথাও ভ্রমণে যাওয়া যাবে না? যেখানে পাওয়া যাবে একটু পার্বত্য ভূমির ছোঁয়া, একটু সবুজের স্পর্শ, একটু নির্জনতা আর তার সঙ্গে যদি সেটা কোন শিবভূমি হয়, তাহলে তো আর কথাই নেই। এরকম ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনের মধ্যে ভেসে উঠলো একটি নাম-ভীমাশংকর। জায়গাটি মহারাষ্ট্রের এক প্রসিদ্ধ শিবভূমি এবং দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম বলে বিশ্বাস করেন আমাদের দেশের ভক্ত মানুষজন। ভ্রমণসঙ্গী ও ইন্টারনেটের সাহায্যে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে সেখানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিলাম। পুনা থেকে ১১০ কিলোমিটার দূরে সহ্যাদ্রি পর্বতের উপর ভীমাশংকর মন্দিরের অবস্থান।

দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর রাতে আমরা তিন বন্ধু হাওড়া থেকে আজাদ হিন্দ এক্সপ্রেসে করে রওনা দিলাম পুনার উদ্দেশ্যে। প্রায় ৩৬ ঘন্টা ট্রেন জার্নির পর সকাল এগারোটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম প্রায় ১৮৫০ কিলোমিটার দূরের পুনা স্টেশন। স্টেশনে নেমে একটু প্রাতরাশ সেরে অটো করে চলে এলাম শিবাজি নগর বাস টার্মিনাল। সেখানে এসে প্রায় দেড় ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর আমরা মহারাষ্ট্র সরকারের ভীমাশংকরগামী বাসে ওঠার সুযোগ পেলাম। শুনলাম প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর ভীমাশংকর যাবার বাস পাওয়া যায়। সাধারণত যাত্রীরা একই দিনে সকাল বেলায় পুনা থেকে বেরিয়ে ভীমাশংকর দর্শন করে আবার পুনা ফিরে আসেন, কিন্তু আমাদের অন্তত একটি সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় দেখার ভীষণ ইচ্ছা ছিল। তাই আমাদের ফেরার তাড়া নেই।

লাল রঙের সরকারি বাস আমাদের নিয়ে টার্মিনাস থেকে বেলা বারোটা নাগাদ বেরিয়ে পড়ল। শহর ছাড়িয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে দিয়ে চড়াই-উৎরাই রাস্তা পেরিয়ে, সুন্দর কালো পিচের হাইওয়ে ধরে বাস ছুটে চলল তীরগতিতে। রাস্তা ভালো থাকায় বাস জার্নির বিশেষ কোনো ধকল সহ্য করতে হয়নি। যদিও স্থানীয় যাত্রী সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকায় সেই আরাম কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। ২/২ সিটে তিনজন মিলে চেপে চেপে বসার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা। প্রচণ্ড ভিড়ের চাপে প্রাণ ওষ্ঠাগত। বুঝলাম সব রাজ্যেই যানবাহন ব্যবস্থা প্রায় একই রকম। ‘নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস’ মনে মনে এসব ভাবতে ভাবতে জানলার দিকে তাকিয়ে দেখি আমরা একেবারে পাহাড়ি রাস্তায় ঢুকে পড়েছি। মনে হচ্ছে যেন হিমালয়ের ন্যাশনাল হাইওয়ে নম্বর ৫৪ ধরে চলেছি হরিদ্বার থেকে যোশীমঠ। একটু ঠান্ডা হাওয়া প্রাণ জুড়িয়ে দিল, উচ্চতা ক্রমশ বাড়ছে; সহ্যাদ্রি পর্বতমালার মনোরম দৃশ্য বাস জার্নির কষ্ট অনেকটা ভুলিয়ে দিল। মাঝেমাঝেই নজরে পড়ছে বেশ বড় বড় জলাশয়; সেই জলাশয়ের পাড় ঘেঁষে সবুজ পাহাড়ের ঢাল। মহারাষ্ট্রের এই অঞ্চলে আমাদের প্রথম আসা, তাই বেশ তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছি প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য। পথের দু'ধারে হলুদ ফুলের সারি, রাস্তার ধারে পশু পাখির ছবি আঁকা অভয়ারণ্যের একটা বড় সাইনবোর্ড নজরে পড়ল। তার মানে আমরা ভীমাশংকর অভয়ারণ্যের একবারে সীমানার কাছে এসে পড়েছি। প্রায় সাড়ে চার ঘন্টা পর আমরা মঞ্চের, গোরেগাঁও, রাজগুরুনগর, প্রভৃতি শহরাঞ্চল পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম ভীমাশংকর।

প্রথম দর্শনেই ভালোলাগা, বাস থেকে নেমে মনে হলো কোন পার্বত্য গ্রামে এসে পৌঁছেছি। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা। হিমেল বাতাসে একটু শীত-শীত ভাব। কুয়াশার চাদর যেন ধীরে ধীরে নেমে আসছে। এখানকার উচ্চতা প্রায় ৩৫০০ ফিট। বাস স্ট্যান্ডের পাশেই দুর্গা মাতার মন্দির। চারিদিকে পূজার সরঞ্জাম ও বিভিন্ন পসরা সাজিয়ে দোকানিদের ভিড়। তীর্থ যাত্রীদের ভিড় সেরকম নেই বললেই চলে। সবাই মন্দির দর্শন করে ফিরে যাবেন। আমরা প্রায় ৩০০ সিঁড়ি নেমে পৌঁছে গেলাম মন্দির চত্বরে। মন্দিরের স্থাপত্য নজর কাড়ার মতো, বহু প্রাচীন কালে পাথরের তৈরি মূল গর্ভগৃহের চূড়াটি প্রায় ২৫ ফুট উঁচু। চূড়ার মাথায় গেরুয়া ধ্বজা লাগানো রয়েছে। গর্ভগৃহের লাগোয়া নাটমন্দির বেশ প্রশস্ত, নাটমন্দিরের দুইপাশে কারুকার্যমন্ডিত পাথরের খিলান। মন্দিরের গায়ে নানা দেবদেবীর মূর্তি, পিছন দিকে মোক্ষ কুণ্ড, প্রাচীর দিয়ে ঘেরা একটি ক্ষুদ্র জলাশয়। আর মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভীমা নদীর উৎস।

আমরা একটি ফুলের দোকানে জিজ্ঞাসাবাদ করে পৌঁছে গেলাম মন্দিরের এক পূজারীর বাড়িতে। তিনি ৭০০ টাকার বিনিময়ে একটি ঘরে আমাদের তিনজনকে থাকতে দিলেন। ঘরটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তবে কমন বাথরুম। স্নান সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মন্দিরের দেবতা দর্শনে। ভীমাশংকর দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, মন্দিরে ভিড় নেই বললেই চলে। অল্পসংখ্যক তীর্থযাত্রীদের লাইন পেরিয়ে প্রথম দর্শন গর্ভগৃহের দেওয়ালে টাঙানো আয়নার প্রতিফলনে। এখানে এটাই রীতি, বাইরে গোটা চারেক ক্লোজ সার্কিট টিভি আর এল.সি.ডি. স্ক্রীন, সেখানেও ভীমাশংকর’জীর দর্শন পাওয়া যায়। শিবলিঙ্গ রূপার আবরণ দিয়ে পরিবৃত। সন্ধ্যা আরতির আগে যখন স্নান করানো হবে তখন সেই আবরণ উন্মোচন করা হবে, তাই সন্ধ্যারতির অপেক্ষায় আমরা নাটমন্দিরে বসে রইলাম।

নাটমন্দিরের অন্দরমহলের চারিদিকে দেখতে দেখতে হঠাৎ দৃষ্টি চলে গেল নাটমন্দিরের ছাদের দিকে। তাকিয়ে দেখি হাজার হাজার কত রংবেরঙের প্রজাপতি সারি দিয়ে বসে রয়েছে। কমলা, সবুজ, নীল, হলুদ, বাদামি, গোলাপি, আরো কত রকমের বিচিত্র প্রজাপতির দল। মনে পড়ল পাশেই তো রয়েছে ভীমাশংকর স্যাংচুয়ারি, যেখানে বিভিন্ন প্রজাতির ফ্লোরা এবং ফনার সন্ধান পাওয়া যায়।

ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এল, মন্দির চত্বর প্রায় জনশূন্য হয়ে গেল। গোটা নাটমন্দির এবং গর্ভগৃহ পরিষ্কার করা হলো। আমরা এল.সি.ডি. স্ক্রীনে দেখলাম - ধীরে ধীরে শিবলিঙ্গের আবরণ উন্মোচন করা হল। আমরা বৃষভরাজ নন্দীকে প্রণাম জানিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। সঙ্গে গুটিকয়েক তীর্থযাত্রী, প্রাণভরে দর্শন করলাম কৃষ্ণবর্ণ জ্যোতির্ময় শিবলিঙ্গ। বেশ বড় গৌরী পট্টর মধ্যে মূল শিবলিঙ্গ। একহাত’এরও কম উঁচু লিঙ্গের মাথায় মাঝখানে সামান্য একটু ফাটলের মত দাগ দেখা যায়, সেইখানে খুব ক্ষীণ ধারায় জল বেরিয়ে আসছে। পুরোহিতমশাই বললেন ওই লিঙ্গের একাংশ মহাদেব এবং অন্য অংশে পার্বতী, আর মাঝে ভীমা নদীর উৎসমুখ। ভীমাশংকরজীর পিছনদিকে দেওয়ালে মা পার্বতীর দন্ডায়মানা সুন্দর মূর্তি। ভীমাশংকরজীকে চিনি, দুধ, দই, মধু ও কর্পূর সহযোগে জল দিয়ে স্নান করানো হলো। স্নানের পর চন্দন এবং ফুলের মালা দিয়ে তাঁকে সাজানো হলো। তখন তাঁর অন্য এক রূপ। আরতির ঠিক আগে আমরা গর্ভগৃহ থেকে বেরিয়ে এসে দরজার সামনে নন্দী মূর্তির ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে ভীমাশংকরজীর আরতি দর্শন করতে লাগলাম, তবে সরাসরি নয়-দর্পণ এর মাধ্যমে। এক অচেনা শ্রুতি মধুর সুরে গান গাইতে গাইতে, ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে, তিনজন পুরোহিত শিবের আরতি করতে লাগলেন। নির্জন পরিবেশে আরতির সেই সুরের মূর্ছনা সহ্যাদ্রি পর্বতমালার গায়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে আমাদের মনে এক অনির্বচনীয় পবিত্রভাব জাগিয়ে তুলল।

আরতি শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মন্দির সংলগ্ন সব দোকান পাট ধীরে ধীরে বন্ধ হতে শুরু করল। আমরা তিনজন তাড়াতাড়ি একটি দোকানে গিয়ে রাতের আহার যখন শেষ করলাম তখন ঘড়িতে রাত আটটা বাজে। এই অঞ্চলে রাত্রিতে আর কেউ বের হয় না। পুরোহিত, সাধু, দোকানি, সবাই শিবের ভোগ আরতি সম্পূর্ণ হয়ে গেলে যে যার নিজেদের বাড়ি বা আশ্রমে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন, কারণ এই পাহাড়ি অঞ্চলের অভয়ারণ্যে এখনো বাঘ, ভাল্লুক, বন্য শুয়োর ও নানা রকম বিষধর সাপ ইত্যাদি আছে। বেশি রাত্রে তাদের ডাক শুনতে পাওয়া যায়, এই জঙ্গলে অনেক ধরনের ঔষধি গাছও পাওয়া যায়। রাতের আহারের পর একটু রংবেরঙের মিষ্টি প্যাড়া আস্বাদন করলাম। অপূর্ব তার স্বাদ, বড় বড় লোহার কড়াই'এর গায়ে লেপে দেওয়া আছে। ওজন দরে এই প্যাড়া বিক্রি হয়। ৩০০ সিঁড়ির দুই ধারে দোকান গুলি। ধীরে ধীরে রাস্তাঘাট সব অন্ধকারে ঢেকে গেল; আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মন্দির চত্বরে এসে পৌঁছলাম। ভীমাশংকর গ্রাম এখন নীরন্ধ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত, মনে হচ্ছে কোন এক অচিনপুরের নির্জন আকাশতলে আমরা তিনজন এসে পড়েছি। পাহাড়ের উপরের দিক থেকে নাম-না-জানা পশু পাখির ডাক ভেসে আসছে। এই গভীর অন্ধকারে মন্দিরের চূড়ার দিকে তাকিয়ে দেখি সি.এফ.এল. ল্যাম্প এর সাদা আলোর ছটা ধীরে ধীরে কুয়াশায় ঢাকা পড়ে

যাচ্ছে। সব মিলিয়ে এক মোহময় পরিবেশ রচনা করে চলেছে। কিছুক্ষণ এই নির্জনতাকে উপভোগ করে আমরা লজে ফিরে গেলাম। পরদিন খুব ভোরে মন্দিরে পুজো দেওয়ার প্রোগ্রাম থাকার জন্য তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরদিন মঙ্গল আরতির ঘন্টার শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙলো। খুব ভোরে স্নান সেরে ভীমা কুন্ড'র জল মাথায় দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। আমাদের লজের মালিক পুরোহিতমশাই, খুব যত্নসহকারে আমাদের পুজো দেওয়ালেন। শিবলিঙ্গের উপর এখন অত্যুজ্জ্বল রূপার আভরণ। আমরা তার উপরেই জল ঢাললাম, ফুল দিয়ে সাজিয়ে আরতি করলাম। তিনি মন্ত্রোচ্চারণ করিয়ে আমাদের পুষ্পাঞ্জলী দেওয়ালেন। জ্যোতির্লিঙ্গের সামনে আমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ নেই। কোন কোলাহল নেই, কোন লাইন নেই, কোন তাড়াহুড়ো নেই, কোন ব্যস্ততা নেই, খুব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সূর্যোদয়ের আগেই আমরা মনের আনন্দে সেই পূজা-অর্চনা সম্পন্ন করলাম। তবে শ্রাবণ মাসে এবং মহাশিবরাত্রির সময় খুব ভক্ত সমাগম হয় এবং মেলা বসে। পূজার্চনা শেষে পুরোহিতমশাই আমাদের কপালে ত্রিপুণ্ড্র এঁকে দিলেন। তিনি আমাদের শোনালেন ভীমাশংকর জ্যোতির্লিঙ্গের পৌরাণিক কাহিনী এবং মাহাত্ম্য।

তিনি বলতে শুরু করলেন - পুরাকালে ত্রিপুরাসুর নামে এক দৈত্য এই জঙ্গলে বাস করত। তার হিংস্র স্বভাব ও অত্যাচারে, স্বর্গ-মর্ত-পাতাল এর অধিবাসী দেব ও ঋষিকূল দারুন বিপন্ন হয়। তারা শরণ নেয় ভগবান দেবাদিদেব মহাদেবের। তাদের প্রার্থনায় স্বয়ং ভগবান শংকর এই ত্রিপুরাসুর দৈত্যকে বিনাশ করতে রাজী হন। তিনি ভীমকায় শরীর ধারণ করে তার সামনে উপস্থিত হন, মহাদেবের এই রুদ্র মূর্তি দেখে অসুর ভয় পেলেও তার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। কয়েকদিনের ভীষন যুদ্ধের পর ত্রিপুরাসুরকে দেবাদিদেব মহাদেব বধ করেন। এই সময় রণ-ক্লান্ত মহাদেব সহ্যাদ্রি পর্বতের উপর, এই ঠান্ডা জায়গায় এসে বিশ্রাম নেন। তাঁর পরিশ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত শরীর থেকে প্রচুর ঘাম ঝরতে থাকে, ক্রমে সেই স্বেদ-ধারা থেকে একটি স্রোতের উৎপত্তি হয় এবং ক্রমে নদীর আকার ধারণ করে। ভীমকায় শঙ্করের দেহ নিঃসৃত বলে এই নদী ভীমা নদী নামে পরিচিত হয়। আজও গভীর জঙ্গলের মধ্যে সেই স্রোতের ধারা দেখা যায়।

অসুর নিধনের পর ভক্তগণ আশুতোষ মহাদেবকে এই বলে অনুরোধ করেন যে, সাধুসন্তদের রক্ষা করার জন্য তিনি যেন কৃপা করে এই ক্ষেত্রে সদাসর্বদা বিরাজ করেন। ভক্তবৎসল ভোলানাথ ভক্তবাঞ্ছা পূরণ করবার জন্য এই সহ্যাদ্রি পর্বতের কোলে জ্যোতির্লিঙ্গ রূপে ভীমাশংকর নামে চিরস্থির হয়ে যান। তাঁর শরীরের স্বেদ আজও ভীমা নদীর ধারা হয়ে নির্গত হয় এই শিবলিঙ্গ থেকে। ভীমাশংকর মহাদেবের পুরাণ কথা শেষ করে পুরোহিত দুই হাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে প্রণাম জানালেন তাঁর সম্মুখে বিরাজমান ভীমাশংকর জ্যোতির্লিঙ্গকে। আমরাও সাষ্টাঙ্গে মহাদেবকে প্রণাম ও স্পর্শ করে বেরিয়ে গেলাম গর্ভগৃহ থেকে।

উদাত্ত কণ্ঠে পুরোহিত বলে চলেছেন –

ওঁ নামো শম্ভবায় চ ময় ভবায় চ

নমঃ শংকরায় চ ময়স্করায় চ

নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ ওঁ।

তাঁর উচ্চারিত পবিত্র মন্ত্র মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক অপূর্ব মোহময় আধ্যাত্মিক পরিবেশ সৃষ্টি করল। পূব আকাশে তখন অরুণোদয় হয়ে গেছে, নীল আকাশ তলে সহ্যাদ্রি পর্বতের ঢালে সবুজ অরণ্য প্রভাত সূর্যের আলোয় এক রঙিন চক্রবাল তৈরি করেছে। নানা রকম পাখির ডাক ভেসে আসছে। দোকানপাট খুলতে শুরু করেছে, ভীমাশংকর গ্রাম ধীরে ধীরে জেগে উঠছে।

ঘরে ফিরে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মন্দিরের আশেপাশে কিছু ছবি তোলার জন্য। মন্দিরের পূর্বদিকে শনি মহারাজের মন্দির, এক বিশাল পিতলের ঘন্টা ঝুলছে এই মন্দিরের সামনে, তার গায়ে লেখা ১৭২৮ খ্রিস্টাব্দে এক পেশোয়া এটা তৈরি করিয়ে ভীমাশংকর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন। বর্তমানে এই ঘন্টাটি নাড়ানো বা বাজানো নিষেধ। মূল মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে দশাবতারের ছোট ছোট মূর্তি খোদাই করা আছে। মন্দিরের সামনে একটি মহারাষ্ট্রীয় ধাঁচের কালো পাথরের দীপস্তম্ভ। বিশেষ বিশেষ পর্বে এখানে একসঙ্গে অনেক প্রদীপ জ্বালানো হয়। মন্দিরের পশ্চিম গাত্রে পাথরে খোদাই করা মেটে সিঁদুর লাগানো হনুমানজীর মূর্তি। মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে ভীমা নদীর উৎস কুণ্ড। ভক্তরা এখানেই স্নান সেরে জল নিয়ে যাচ্ছেন বাবার মাথায় ঢালার জন্য। কুন্ডে'র একধারে একটি ছোট শিবলিঙ্গ, অন্যদিকে শ্রী গণেশের মূর্তি; কুন্ডের জলে অনেক ছোট ছোট মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। মন্দিরের পূর্ব পাশ দিয়ে একটা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে; সেই সিঁড়ির প্রান্তে একটি মেঠো পথ চলে গেছে গভীর জঙ্গলে। সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে পশ্চিম দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম, দূরে সবুজ পাহাড়ের কোলে ভীমাশংকর গ্রামের ঘরবাড়ি। নীল আকাশ তলে সবুজ সহ্যাদ্রি পর্বতের ঢালে ভীমাশংকর মন্দিরের চূড়া সূর্যের কিরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, সেই চূড়ায় লাগানো গেরুয়া ধ্বজা মৃদুমন্দ হাওয়াতে পতপত করে উড়ছে, এক আনন্দময় পরিবেশ। বেশ কিছু ছবি তুলে নেমে এলাম মন্দির প্রাঙ্গণে।

এবার ফিরে যাবার পালা, ঘরে ঢুকে ব্যাগ পত্র গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লাম বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশ্যে। আবার প্রায় ৩০০ পাথরের সিঁড়ির ধাপ পায়ে-পায়ে অতিক্রম করে এলাম বাস স্ট্যান্ডের কাছে। কিছু কিছু মারাঠি ভক্তের আগমন ঘটছে। সিঁড়ির দুই ধারে ফুলের পসরা সাজিয়ে গ্রামের মহিলারা বসেছে। সতেজ রঙিন ফুল আনা হয়েছে কাছেই গ্রাম বা জঙ্গল থেকে। লোহার কড়াইতে রঙিন প্যাড়া, পথের ধারে ভিক্ষুক খঞ্জনি বাজিয়ে মারাঠি সুরে গান গাইছে। সিঁড়ির দুই ধারে পাহাড়ি ঢালে সবুজ জঙ্গল। ৩০০ সিঁড়ির শেষে বাঁদিকে দুর্গা মন্দির। মন্দিরের চূড়া, সামনের পথ নবরাত্রি উপলক্ষে আলো দিয়ে সাজানো। রাতের আলোকসজ্জায় এই মন্দিরের রূপ মনে মনে কল্পনা করলাম। দুর্গা মন্দিরের পূর্বদিকে প্রবেশপথ, প্রথমেই নাট মন্দির। সেই নাটমন্দিরে এক ভক্ত এক ধরনের তারের বাদ্যযন্ত্র বাজিয়ে একটি ধূন গাইছেন। তাঁর গানের সুরের মূর্ছনা, সেই বাদ্যযন্ত্রের মিষ্টি আওয়াজ, নাটমন্দিরে প্রতিধ্বনিত হয়ে এক মনোমুগ্ধকর মায়াজাল সৃষ্টি করে চলেছে। মূল মন্দিরে সিংহবাহিনী বিরাজমানা আছেন, তাঁকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। যেতে হবে আরো অনেক দূর, তবু ইচ্ছে করেনা ভীমাশংকর ছেড়ে চলে যেতে। বাসস্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পরেই আমাদের পুনা যাওয়ার বাস চলে এলো। পুনা থেকে ট্রেনে করে পূর্ণ, সেখান থেকে হিঙ্গলি স্টেশন হয়ে চলে যাব আর এক মহারাষ্ট্রের তীর্থক্ষেত্র ওন্দানাগনাথ।

প্রায় এক দশক আগের ভ্রমণকাহিনী আজ লিখতে বসে ভাবি যে সেই সময় গুরুদেবের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ হয়নি বা ঈশ্বরের কৃপায় ক্রিয়াযোগের কোন পদ্ধতি আমি প্রাপ্ত হইনি। যদি পেতাম তাহলে এই ভীমাশংকর ভ্রমণে আরও এক নতুন মাত্রা যোগ হত। সহ্যাদ্রি পর্বতের সবুজে ঘেরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে, দেব দেউলের এক নির্জন স্থানে বসে, অবশ্যই গুরু পরম্পরা প্রাপ্ত এই দুর্লভ ক্রিয়াযোগ পদ্ধতি অনুশীলন করতাম। প্রাণকে নিয়ে মূলাধার থেকে আজ্ঞা চক্র হয়ে হয়তো তাঁর কৃপায় পৌঁছে যেতাম সহস্রারে, যেখানে পৌঁছে হয়তো সমাধিস্থ হয়ে যেতাম। দেব দুর্লভ দর্শন, রোমাঞ্চকর অনুভূতি ও অভূতপূর্ব উপলব্ধি নিয়ে আবার ফিরে আসতাম এই ধরাধামে। না ফিরতে পারলেও কিছু এসে যেত না, চিরতরে লীন হয়ে যেতাম দেবাদিদেবের চরণে। সত্যিই দেবভূমি ভীমাশংকর সাধন ভজনের এক অতি আদর্শ স্থান। এখানকার শুদ্ধ পরিবেশ অন্নময় কোষ থেকে আনন্দময় কোষে উত্তরণের এক অসীম শক্তির উৎস। সেখানকার স্থান মাহাত্ম্য সাধারণ মন ও বুদ্ধির অগোচর। এই জীবনে জানিনা আবার কবে যাওয়া হবে বা আদৌ হবে কিনা, কিন্তু মানস ভ্রমণ অবশ্যই সম্ভব। আর গুরুদেবের কৃপায় যদি কোনও দিন সূক্ষ্ম শরীরে ভ্রমণ করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারি, তাহলে পুনঃ পুনঃ দর্শনে এই মানব জীবন ধন্য করব, এই আমার অভিলাষ।

রাম ত্যাজি, কভু গুরু নাহি ভুলি

– অমিত চ্যাটার্জী

গুরুগতপ্রাণা যোগিনী সহজো বাই'এর জন্ম 25 জুলাই 1725 সালে দিল্লির পরীক্ষিতপুর নামক স্থানে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে। মাত্র এগারো বছর বয়েসে নিজের বিবাহ অনুষ্ঠানের দিনই প্রসিদ্ধ সাধক কবি চরনদাস'জীর দর্শন লাভ। প্রথম পরিচয়েই চরনদাসজী সহজোকে শৃঙ্গার করতে দেখে, জীবনের অনিত্যতা এবং দেহের নশ্বরতা সম্বন্ধে উপদেশ দেন। পরিণামস্বরূপ সহজো তৎক্ষণাৎ সংসার ত্যাগ করে গুরু সেবায় জীবনকে নিয়োজিত সমর্পিত করেন। চরনদাসের 108 জন শিষ্যর মধ্যে যোগ সাধনার নিরিখে সহজো ছিলেন একেবারেই আলাদা। অতুলনীয় ছিল তার গুরুভক্তি। পরবর্তীকালে গুরু চরনদাস যোগ সাধনার ধারাকে অব্যাহত রাখতে শিষ্যা সহজো'কেই নিজের উত্তরসূরী রূপে মনোনীত করেন।

লাহিড়ী বাবা ও পঞ্চানন বাবা'র জীবনী গ্রন্থ পড়ে জেনেছি - যোগ সাধনার উন্নত স্তরে পৌঁছে সাধকের মনের ভাব আপনা থেকেই ছন্দের আকারে প্রকাশিত হয়। সহজো সেই উচ্চ অবস্থা মাত্র 18 বছর বয়েসেই অর্জন করতে সমর্থ হন, এবং রচনা করেন "সহজ প্রকাশ"। এই গ্রন্থ তার সাধন অনুভূতি ও গুরুভক্তির এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

গুরু পূর্ণিমা উপলক্ষে তাঁর গুরু ভক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন "রাম তাজু, পর গুরু না বিসারু" মনন করাই এই প্রবন্ধে আমাদের প্রচেষ্টা :

राम तजूँ पै गुरु न बिसारूँ। गुरु के सम हरि कूँ न निहारूँ॥
हरि न जन्म दियो जगमाही। गुरु ने आवागमन छुटाहीं॥
हरि ने पांच चोर दिये साथा। गुरु ने लइ लुटाय अनाथा॥
हरि ने कुटुँब जाल में गेरी। गुरु ने काटी ममता बेरी॥
हरि ने रोग भोग उरझायो। गुरु जोगी कर सबै छुटायो ॥
हरि ने कर्म मर्म भरमायो। गुरु ने आतम रूप लखायो॥
फिर हरि बंध मुक्ति गति लाये। गुरु ने सब ही मर्म मिटाये॥
चरन दास पर तन मन वारूँ। गुरु न तजूँ हरि को तजि डारूँ॥

–(सहज प्रकाश, सहजो बाई)

-(সহজ প্রকাশ, সহজো বাই)

ভাবকে যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রেখে, ভাষাকে কিঞ্চিৎ ক্রিয়ার আঙ্গিকে বাংলায় পরিবর্তিত করলে অর্থ দাঁড়ায় :

রাম ত্যাজি, কভু গুরু নাহি ভুলি | গুরু সমুখে হরি দর্শন যাই ভুলি ||
জগৎ মাঝে জীবের জন্ম, নারায়ণেরই লীলা | জন্ম মৃত্যু রোধিয়া গুরু, মুক্ত করি দিলা ||
হরি ফেলিলেন পঞ্চ চোরের কবলে | পরম যতনে গুরু কোলে নিলা তুলে ||
হরি ঘিরেলেন কুটুম্বদের মাঝে | মমতা পাশ কাটি গুরু, মুক্ত করিলা যে ||
হরি ঘিরেলেন রোগ ভোগের মাঝারে | গুরু রক্ষিলা মোরে অকুল পাথারে ||
হরি ফাঁসাইলে মোরে কর্ম মায়াজালে | স্বরূপ দেখাইলা গুরু, তারকা মম ভালে ||
আমাকে আমার থেকে লুকাইলো হরি | কুটস্থ দীপ জালি গুরু, ত্বরিলা এ তরী ||
হরি রচিলেন বন্ধন মুক্তি রূপ ক্রীড়া | গুরু হরিলেন মোর সকল দুঃখ পীড়া ||
শ্যামাচরণ চরণে করি সর্বস্য সমর্পন | গুরু কভু নাহি ত্যাজি, যেন ত্যাজি এ জীবন ||

জগত সংসারে দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু বিদ্যমান সবই ঈশ্বরের (যার মানব প্রদত্ত নাম হরি, রাম, আল্লাহ, বা God) সৃষ্টি | স্থূল রূপে জ্যোতিষ্ক মন্ডল, নক্ষত্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ জীবজগৎ- সবকিছুর উৎপত্তিই ঈশ্বরের ইচ্ছায় | আবার জন্ম-মৃত্যুর চক্র, দুঃখ, বেদনা, রোগ, ভোগ, জরা, ব্যাধি, তৃষ্ণা, কামনা সহ সমস্ত মায়াজালও তারই সৃষ্টি - এবং সবেতেই তিনি আছেন |

জীবের মানব জন্ম এক বৃহত্তর সম্ভাবনা রূপে হয় | এই অবস্থায় জীবাত্মার কাছে মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অন্তঃকরণ, প্রজ্ঞা, সহ একটি অত্যন্ত উন্নত যন্ত্র থাকে - যার নাম মানব দেহ | সঙ্গে দেওয়া হয় প্রচুর সময়, জীবনীশক্তি, এবং চয়ন করার স্বাধীনতা (Free Will, Matthew 23:37) | কিন্তু এতকিছু নিয়ে সে কি করবে, তার কোনো নির্দিষ্ট পথ প্রদর্শন থাকে না | তাই এই সম্ভাবনার বীজ মহীরুহে পরিণত হয়ে জীবকে মুক্ত করে দেবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই |

জন্মের সাথে সাথেই মানব শরীরের ভিতরে যে পাঁচজন চোর আছে, যাদের আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় বলি (তার সৃষ্টিও ঈশ্বরই করেছেন) তারা অবিরত তাকে ভ্রমিত করতে থাকে | ইন্দ্রিয়চঞ্চলতা তাকে অদ্বৈত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্যুত করে; এমনকি দ্বৈতের ভূমিতে দাঁড়িয়েও সে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম হয় | যেহেতু তার কাছে Free Will আছে, তাই সৃষ্টির অলঙ্ঘনীয় নিয়মে (যা সৃষ্টিকর্তারই তৈরি), তার চয়নের পরিণামও তাকেই ভোগ করতে হয় | কিন্তু Free will এর সাথে পথ প্রদর্শন নেই, তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানুষ Free will এর সঠিক ব্যবহার করে উঠতে পারে না | পরিনাম স্বরূপ সে বিভিন্ন যোনিতে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে থাকে, এবং অশেষ দুঃখ-যাতনা, যন্ত্রণা ভোগ করে | যদিও ঈশ্বর মানবদেহে আনন্দময় কোষ, সূক্ষ্ম শরীর, কারণ শরীর সহ বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্রের রচনা করেছেন; কিন্তু সেসব কোন কিছুই মানুষের কাছে উপলব্ধ নয়, কারণ - ইন্দ্রিয়চঞ্চলতা | তার উপরে আছে ঈশ্বরীয় মায়া – যা কখনো আত্মীয়-পরিজন রূপে আমাদের উপর বন্ধন সৃষ্টি করে, আবার কখনো রোগ-ব্যাধি রূপে প্রভূত পীড়া দেয় | ফলে আনন্দময় জীবাত্মা আজ চূড়ান্ত বিষাদগ্রস্ত- Stressed, Depressed |

এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতে দয়াময় মায়াধীশ গুরুর আগমন ঘটে | যিনি জীবকে দেখান মুক্তির পথ, শান্তির পথ, আনন্দের পথ | নিজের ভিতরের ঐশ্বর্য ভান্ডারের সাথে তিনি আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন | কর্ম এবং কর্মফলের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভ ও জন্ম-মৃত্যুর চক্র ছিন্ন করার পথ তিনি দেখিয়ে দেন, এবং সেই পথে সঞ্চালিতও করেন | শেষে গুরুই জীবকে দুঃখ-যন্ত্রণার কবল থেকে রক্ষা করে চির মুক্তি প্রদান করেন | তাই সহজো বলেছেন- “রাম তাজু, পর গুরু ন বিসারু”| তবে, এ ধরনের উক্তি পরমাত্মা অর্থাৎ যিনি আমাদের সৃষ্টিকর্তা তার প্রতি উপেক্ষা বা অপমানসূচক বলে মনে হতে পারে | কিন্তু যারা মুক্তির জন্য আতুর,

তাদের কাছে গুরুই সব, এবং তার স্থান স্বয়ং ঈশ্বরেরও উপরে | বস্তুত, যে ব্যক্তির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা যত প্রবল, তার গুরুভক্তি ততোই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়; এবং সেই সাধক তার গুরুভক্তির সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছে এইভাবেই শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে থাকেন | তাই দেখা যায় কবীরও বলেছেন:

গুরু গোবিন্দ দো খরে, কাকে লাগু পায় |
বালিহারী গুরু আপনে, গোবিন্দ দিয়ো বাতায় ||
ইয়ে তন বিষ কি বেলড়ি, গুরু অমৃত কি খান |
শিষ দিয়ে সে গুরু মিলে, বো ভি সস্তা জান ||

অর্থ : গুরু ও গোবিন্দ আমার সামনে একসাথে অবতীর্ণ হলে, আমি গুরু চরণেই আগে প্রণত হবো - কারণ তিনিই আমায় গোবিন্দ রূপ চিনিয়ে দিয়েছেন | এই শরীর বিকারগ্রস্ত হাওয়ায় বিষতুল্য, অমৃত রূপ গুরু সেই বিষ হরণ করে আমায় অমৃতত্বে পৌঁছে দেন | তাই যদি মস্তকের বলিদান দিয়েও গুরু লাভ হয়, তবে তা অত্যন্ত স্বল্প মূল্য বলেই মনে করা কর্তব্য |

শ্রী শ্রী গুরু গীতাতেও আমরা দেখি, গুরুর স্থান দেবাদিদেব মহাদেবের উপরে | তাই তো বলা হয়েছে:

শিবে ক্রুদ্ধে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ ক্রুদ্ধে শিবো ন হি ।
তস্মাৎ সর্বপ্রয়ত্নেন শ্রীগুরুং শরণং ব্রজেৎ ॥ ৪৪ ॥

অর্থ : যদি দেবাদিদেব মহাদেব রুষ্ট হন, তবে গুরু তার শিষ্য কে তার প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে সমর্থ | কিন্তু গুরু রুষ্ট হলে স্বয়ং মহাদেবও তাকে রক্ষা করতে অসমর্থ | তাই, গুরু চরণে শরণ গ্রহণ মানব জীবনের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা হওয়া কর্তব্য |

গুরুকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েও, ‘রাম তাজু’ (অর্থাৎ রাম বা ঈশ্বর কে ত্যাগ করি) শব্দ দুটি এখনো গলধঃকরণ করতে সমস্যা হচ্ছে | সাধারনত এই জগত সংসারে পরমাত্মার ব্যাপ্তি বিভিন্ন রূপে- তিনিই মায়া বা প্রকৃতি রূপে জীবকে আবদ্ধ করে রেখেছেন মায়াজালে | যেখানে তার সর্বোচ্চ সম্ভাবনা - পশুত্ব ; কেবল আহার, নিদ্রা, ভয় ও মৈথুন | জীবের যাবতীয় দুঃখ-কষ্ট, মরণশীলতা এবং জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তন সবই তার খেলা | আবার মায়াধীশ গুরু রূপেও হরিই (ঈশ্বর) আসেন জীবকে উদ্ধার করতে | অর্থাৎ পরমাত্মার সকল রূপ জীবের কাছে সুখপ্রদ নয়, অধিকাংশরই সৃষ্টি তাকে দুঃখ সমুদ্রে নিমজ্জিত রাখার জন্যই হয়েছে | তাই তো আজ চারিদিকে এতো দুঃখ, এতো কষ্ট, এতো হাহাকার | তাই সহজো বাই বলেছেন, পরামাত্মার যে রূপে তিনি গুরু হিসাবে জীবের উদ্ধারকল্পে অবতীর্ণ হন সেই রূপই তার অত্যন্ত প্রিয় | অন্যান্য রূপ যাতে তিনি মহামায়া বা প্রকৃতি রূপে এসে সাধকের সাধনায় বাধা সৃষ্টি করেন তাকে সহজো সর্বৈব পরিত্যাগ করেছেন | ধন্য সহজো বাই এর গুরুভক্তি, ধন্য গুরু চরনদাস |

---- জয় গুরু

References:

- सहजो बाई, सहज प्रकाश.
- https://www.bibleref.com/Matthew/23/Matthew-23-37.html
- आचार्य प्रशांत, राम तजूँ पर गुरु न बिसारूँ, संत सहजोबाई पर (2018).
- Mark Griffin, “Sri Guru Geeta-108 Sutras of Awakening,”.

গুরুপূর্ণিমা

– শিউলি গাঙ্গুলী

এই গুরুপূর্ণিমার প্রাক্কালে গুরুদেবের চরণ স্মরণ করে ক্রিয়া অনুভূতি ও ভক্তির আলোকে গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। তথ্য বলে, আষাঢ় পূর্ণিমার পুণ্যতিথি’কে মহাঋষি বেদব্যাসের জন্মতিথি হিসাবে মেনে গুরুকে এই দিনে বিশেষ রূপে শ্রদ্ধা জানানো হয়। তাই এই পূর্ণিমা - গুরুপূর্ণিমা বা ব্যাসপূর্ণিমা হিসাবে পরিচিত। পুরাণ মতে, আদিযোগী মহাদেব এই তিথিতে আদিগুরুতে রূপান্তরিত হয়ে সপ্তঋষিকে মহাজ্ঞান প্রদান করেন। তাই এই তিথি গুরুপূর্ণিমা হিসাবে পরিচিত। বৌদ্ধ মতে বোধিজ্ঞান লাভের পর এই আষাঢ় পূর্ণিমার পূন্য তিথিতেই গৌতম বুদ্ধ প্রথম উপদেশ দেন সারনাথে। তাই বৌদ্ধ ধর্মেও গুরুপূর্ণিমার মাহাত্ম্য অসীম।

এই তত্ত্ব, দিনটির মাহাত্ম্য আক্ষরিক ভাবে নির্ধারণ করে। প্রশ্ন জাগতে পারে, গুরুকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এই একটি বিশেষ দিনই কেন ধার্য করা হলো, গুরু তো অনন্ত শ্রদ্ধার পাত্র- তাঁকে তো আমরা সদা সর্বদাই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করব, আলাদা একটি দিন কেন? উত্তরে 'উপলব্ধি' বলে, প্রকৃত গুরু শিষ্যের অন্তরে একাত্ম অবস্থায় সর্বদাই বিরাজ করেন। তাই, সূর্য যেমন সব সময় উপস্থিত থাকলেও প্রত্যেক সূর্যোদয়ের সাথে নতুন প্রভাতকে অনুভব করি, তেমনই প্রতি গুরুপূর্ণিমায় আমরা আমাদের অন্তরে একাত্ম অবস্থায় থাকা গুরুদেবকে নতুন করে শ্রদ্ধা জানাই, যেন তাঁর দেখানো আলোর পথে আমাদের হৃদয় পূর্ণিমার স্নিগ্ধ আলোর মতো আলোকিত হয়। সংসারের নিত্য নৈমিকতার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে আমরা প্রায়শই বিস্মৃত হই তাঁর দেখানো সত্য উপলব্ধির পথ, তাই গুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর মধ্যে দিয়ে আমরা বারবার ফিরে আসার চেষ্টা করি সত্য উপলব্ধির পথে। তাঁর মায়ার সংসারে সত্য দুই প্রকার - ১. যাহা মানব সাধারণের পঞ্চ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও তদুপস্থিত প্রমান/ অনুমানের দ্বারা লব্ধ, ২.যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তিগ্রাহ্য। প্রথম উপায় দ্বারা লব্ধ জ্ঞানকে বিজ্ঞান বলা যায়। দ্বিতীয় উপায় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান-আত্মজ্ঞান যা শুধুমাত্র গুরুই দিতে পারেন। তিনিই গুরু যিনি আমাদের তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করে যোগযুক্ত করে দেন। গুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ শুধুমাত্র তাঁর চরণে পুষ্প নিবেদন নয়, গুরুকে শ্রদ্ধা জানানোর অর্থ তাঁর দেখানো পথে হৃদয়ে তাঁকে ধারণ করা, সর্বত্র তাঁর আনন্দময় উপস্থিতি অনুভব করা। তাই এই গুরু পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে তাঁর চরণে নতুন করে আর একবার শ্রদ্ধা নিবেদন করি-

পথ হয়ে তুমি হৃদয়ে বিরাজ প্রভু-

জ্ঞান হয়ে তুমি মনন জুড়িয়া থাক,

সেবা যেন নাথ ভালোবাসা হয়ে যায়,

কৃপা করে তুমি অহং দিও মুছায়ে।

প্রাণস্পর্শ

– দীপাঞ্জন দে

নিমজ্জিত যেথায় জগৎ বিষন্ন তিমিরে,
সন্ধ্যা তারার সন্ধান তুমি দিলে কৃপাভরে।
ছিলাম দিশেহারা, পথের পথিক বনে,
তোমার নির্মল হাস্য দিল এনে,
আনন্দ, সাহস, ও ভরসা।
মনে জাগে ভীষণ বিক্রম সহসা।
দিব্য আলোক রূপের হল প্রকাশ,
অন্তরে মোর মৃদু মধুর বাতাস,
লাগায় দোলা অমৃত উৎস যেথায়,
নিরন্তর নির্ঝরিনী ভরে শীতলতায়।
প্রাণ ভরে প্রাণের আনন্দে,
নির্জীব প্রাণ নেচে ওঠে প্রবল ছন্দে
কি দ্বন্দ্ব কি সীমানা আজ?
আজ, পরবো নব আলোকের সাজ।
পথিক হৃদয় আজ প্রাণের উৎসে মিলবে,
পরিচিত সেই দেশের দেখা বুঝি আজ মিলবে।
থাকবেনা আর এই পথিক বেশ তবে,
ভেবে মরি আর তবে কি রবে?

ভাবনা মোর ছুট দিলো ভাবনার দেশ,

হায়! পথিক মন তবুও চায় পথিকের বেশ।

দয়া কর আজ ফের এই অকিঞ্চনে,

দাঁড়াবে কি এসে আজ এই নিরজনে?

প্রাণ জানে, প্রাণের ব্যাথা সেই জন জানে,

বিরহে যে ফিরেছে প্রাণের সন্ধানে।

প্রাণস্পর্শ কি পাওয়া যায় সেই পাষাণে?

অভয়পদ জানি আছে ওই যুগলচরণে।

- ০ -

तरति शोकमात्मवित्

– सुदीप चक्रवर्ती

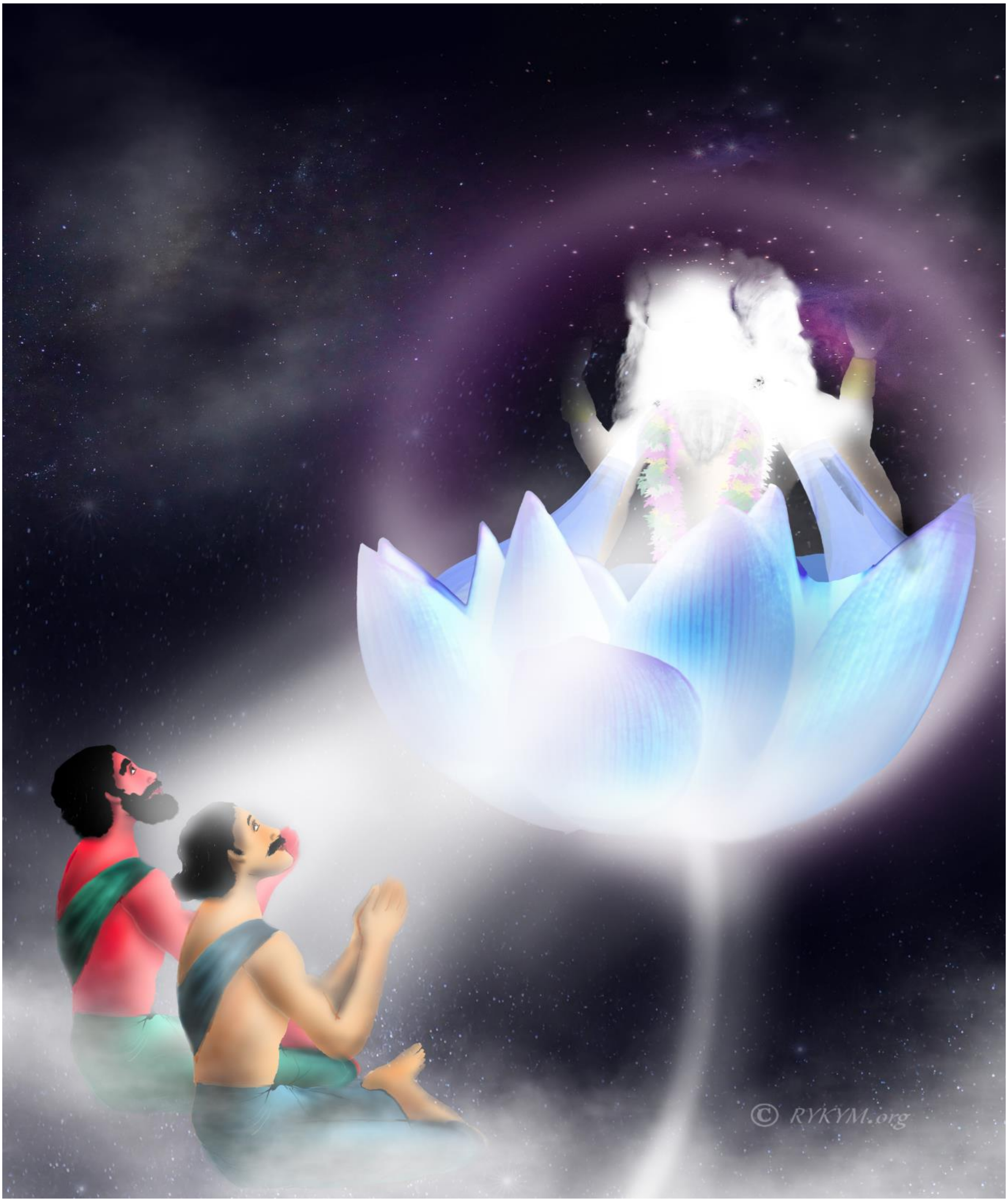

भारत हमेशा से आध्यात्मिक क्रांति का जन्मस्थान रहा है। समय-समय पर ऋषियों ने हमें आत्म-पूजा के सूत्र दिए हैं। इन सूत्रों को कभी शास्त्रों में तो कभी पौराणिक कथाओं के माध्यम से आम लोगों तक पहुँचाया जाता है। हमारे ऋषि-मुनि प्रबुद्ध दूरदर्शी थे, इस ज्ञान को अक्षुण्ण रखने के लिए उन्होंने इन सूत्रों को कथा के रूप में संजोए रखा। ऐसी ही एक घटना छांदोग्य उपनिषद की अध्याय 8.7 में दी गई है, जिसमें इंद्र और विरोचन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रजापति ब्रह्मा के पास आते हैं।

****

असंख्य तारो से आलोकित स्वर्ग में प्रजापति ब्रह्मा आत्मज्ञान के बारे में उपदेश दे रहे थे | ब्रह्मा कहते है, 'आत्मा दोष और दु:ख से मुक्त है, क्षुधा और पिपासा से मुक्त है, जिसे आत्मा का ज्ञान हो गया उसके लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है | अगर तुम्हें सत्य जानना है तो आत्मा के वास्तविक स्वरूप, अर्थात स्वयं को जानो "| प्रजापति के यह वाक्य देवों और असुरों के कानों में पड़े | दोनों ने निश्चय किया कि उन्हें भी आत्मा के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि उन्होंने यह समझा आत्मज्ञान से ही सारी इच्छाओं की पूर्ति संभव है |

देवों और असुरों ने अपने-अपने प्रतिनिधि को ब्रह्मा के पास भेजने का निश्चय किया| देवों ने अपने राजा इंद्र और असुरों ने अपने राजा विरोचन को अपना प्रतिनिधि चुना| दोनों लोग ब्रह्मा के पास पहुंचते है और ब्रह्मा से आदरपूर्वक आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानने की इच्छा प्रकट करते है |

'एक पात्र में जल ले आओ', ब्रह्मा ने आदेश दिया| दोनों पानी से भरा हुआ एक पात्र ले आये | 'पात्र में झाँकने पर क्या दिख रहा है?' - ब्रह्मा ने पुछा| दोनों राजाओं ने उत्तर दिया - 'हमें अपना मुख और शरीर दिखाई दे रहा हैं | यहाँ तक की हमारे केश और नख भी दिखई दे रहे है| 'यही आत्मा है|' - प्रजापति ने कहा, 'यही अमर है, यही आत्म स्वरूप है|'

ब्रह्मा के वचन सुनने के बाद इंद्र और विरोचन ने समझा कि उन्हें आत्मा का ज्ञान हो गया है और वह प्रसन्न मन से अपने-अपने गंतव्य की ओर लौट गए| लेकिन प्रजापति ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ की दोनों राजाओं ने अपनी तरफ से कोई भी प्रश्न नहीं किया| उन्होंने अज्ञानवश शरीर को ही आत्मा समझ लिया| जो भी शरीर को अमर आत्मा समझता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती |

जब विरोचन असुरों के सामने पहुंचा तो उसने कहा कि यह शरीर ही आत्मा है, जो इस सत्य को जानता है, वह सब कुछ जानता है। अगर शरीर तृप्त हो जाए तो हम अपनी सभी मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं। दूसरी ओर, इंद्र बहुत हैरान थे। अपने रथ पर सवार इंद्र को स्वर्ग के मार्ग का सुंदर दृश्य दिखाई तक नहीं दे रहा था। इन्द्र सोच रहे थे कि यदि यह शरीर ही आत्मा है तो इसकी मृत्यु के साथ-साथ आत्मा का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है, फिर यह अमर कैसे हो सकता है। इन विचारों के बीच, इंद्र ने सारथी को रथ को ब्रह्मा के निवास की ओर वापस मोड़ने के लिए कहा।

इंद्र के लौटने पर ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। जब इन्द्र ने प्रजापति के सामने अपनी शंकाएँ रखीं तो उन्होंने कहा, - जो स्वप्न में सुखपूर्वक विचरण करता है, वह आत्मा है। यह उत्तर सुनकर इन्द्र प्रसन्न हो गए, और फिर लौट पड़े। लेकिन यात्रा के दौरान

उन्होंने सोचा कि यह आवश्यक नहीं है कि सपना अच्छा ही हो, बुरे सपने भी नींद में आ सकते हैं। तब यह आत्मा का रूप नहीं हो सकता क्योंकि सुख का प्रवाह निरंतर नहीं होता है। इन्द्र इस शङ्का को मन में धारण किये हुए एक बार फिर ब्रह्मा के पास गए।

ब्रह्मा ने इंद्र के संशय को दूर करते हुए कहा, “शरीर से जुड़े रहने पर आत्मा को सुख-दुख का अनुभव होता है। पर जब आत्मा का शरीर से जुड़ाव नहीं रहता तो वह सुख-दुख से परे हो जाता है। आत्मा अपरिवर्तित रहती है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। आत्मा को पता है कि वह हमेशा से मौजूद है और अमर है”।

ब्रह्मा ने इंद्र के संशय को दूर करते हुए कहा कि - “शरीर से जुड़े रहने पर आत्मा को सुख-दुख का अनुभव होता है - जब आत्मा का शरीर से जुड़ाव नहीं रहता तो वह सुख-दुख से परे हो जाता है। आत्मा अपरिवर्तित रहती है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। आत्मा को पता चलता है कि यह हमेशा से मौजूद है और अमर है”।

प्रजापति ने इंद्र से कहा, "क्या तुमने आकाश को देखा है| आकाश का कोई भी स्वरूप नहीं होता है, परन्तु यही आकाश कुछ समय के लिए विद्युत, मेघ और विभिन्न रूप धारण करता है और फिर ये रूप विलीन हो जाते है, पर आकाश अपरिवर्तनीय रहता है | बादलों की तरह यह शरीर भी जन्म लेता है और मरता है पर आकाश की तरह आत्मा अपरिवर्तनीय रहता है| कुछ समय के लिए ऐसा आभास होता है कि सत्य किसी स्वर्णिम जगत में छुप गया है, जैसे किसी सोने के पात्र ने उसका मुख ढक दिया हो, परन्तु आत्मा स्वर्ण के चमक को फीका कर, स्वयं ही प्रकाशित हो जाती है |

जब आत्मा को अपने स्वरूप का बोध होता है वो स्वयं प्रकाशित हो जाती है| यही परम ज्योति है, अपने सत्य स्वरूप का ज्ञान होने पर आत्मा के आनंद की सीमा नहीं रहती| ब्रह्मा ने आगे कहा, "क्या तुमने कभी भैंस को गाड़ी से बंधे देखा है? आत्मा भी इसी प्रकार शरीर से बंधा है| लेकिन भैंस हर समय गाड़ी से बंधा नहीं रहता, वह कभी नदी या तालाबों में स्नान करता है तो कभी घास चरने मैदानों में चला जाता है| इसी तरह आत्मा भी शरीर के बंधनों से मुक्त होकर आनंद से विचरण करती है|

इंद्र हमारी आंखें दृश्यों के देखने का एक यंत्र मात्र है| पर दृश्यों को देखने वाली आत्मा है | इसी प्रकार हमारी बाकी इन्द्रिया भी अलग-अलग वस्तुए जैसे रूप, रंग, गंध, स्पर्श आदि का उपभोग करने के यंत्र है पर इसका वास्तविक उपभोग तो आत्मा करती है | इसलिए आत्मा ही पूर्ण है |

इंद्र ने आत्मज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा को धन्यवाद दिया और वापस लौटकर ये गूढ़ रहस्य बाकी देवताओं को बताया| आत्मा का ज्ञान होने पर देवताओं की सारी इच्छाओं की पूर्ति हुई और वे समस्त लोकों के स्वामी हुए| जो कोई भी आत्मा के स्वरूप का सठिक बोध कर लेता है उसे भी सरे सुख और जगत प्राप्त हो जाते है |

(The one who knows the Atman, he goes beyond pain – English Translation)

India has always been the birthplace of spiritual revolution. From time to time, the sages have given us the sūtras (summarizing esoteric teaching) of self-inquiry. These sūtras are sometimes conveyed to the common man through scriptures or mythology. Our sages were enlightened visionaries. To keep this knowledge intact, they preserved these sūtras in the form of stories. One such incident is given in section 8.7 of the *Chandogya Upanishad,* in which Indra and Virochana come to Prajapati Brahma to gain knowledge of the Self.

****

In the high heaven, lit by innumerable stars, Prajapati Brahma was preaching about knowledge of Self. Brahma says, 'The self is free from defects and sorrows, free from hunger and craving, nothing is unattainable to the one who has attained the knowledge of the Self. Know this truth, then you will know the real nature of the Self - so know yourself".

These words of Prajapati fell into the ears of Devas and Asuras. Both decided that they too should know about the soul, because they understood that it was possible to fulfil all their desires only through knowledge of the Self.

The Devas and Asuras decided to send their representatives to Brahma. The Devas chose King Indra and the Asuras chose their King Virochana, as their representative. Both Kings approach Brahma and respectfully express their desire to know the true nature of the Self from Brahma.

"Bring water in a vessel", Brahma ordered. Both brought a vessel full of water. "What do you see when you look into the pot?", asked Brahma. Both the kings replied, "We can see our faces and bodies, even our hair and nails are visible.”: This is the soul," said Prajapati., "This is immortal, this is the Self."

Hearing Brahma's words, Indra and Virochana thought that they had attained the knowledge of the self, and returned to their palaces with a contented heart. But Prajapati Brahma was surprised to see that both the kings did not ask any further questions, out of ignorance, they both thought the body to be the self. Whoever considers the body to be the immortal self, can never attain knowledge".

When Virochana reached the asuras, he proclaimed that this very body is the soul, and the one who knows this truth, knows everything. He told the Asuras that if the body is satisfied, then they can fulfil all their desires. On the other hand, Indra was very perplexed. Indra riding on his chariot was not even looking at the beautiful view of the heavenly path. Indra was thinking that if this body is the soul, then along with its death the self also ceases to exist, then how can it be immortal! Amidst these thoughts, Indra asked the charioteer to turn the chariot back to the abode of Brahma.

Brahma was very pleased when Indra returned. When Indra put his doubts in front of Prajapati, Prajapati answered, "The one who roams happily in dreams is the self. The self is ever blissful." Hearing this answer, Indra returned, but during the journey he thought that it is not necessary to have blissful dreams all the time; nightmares can also occur in one's sleep. Therefore, this cannot be the real form of the self because the flow of happiness depends on the nature of dream. Indra, wearing this doubt in mind, once again returns to Brahma.

Hearing Indra's curiosity, Brahma said that the one who remains still, calm, and dreamless in sleep, is the soul. He is satisfied and self-sufficient. Hearing this, Indra left, but on his way a doubt erupted again in his mind that if the one who is sleeping is the soul, then how does he know that he is awake or is sleeping? And if that's how it is, then how can the soul be fulfilled? With this confusion, Indra once again returns to Brahma.

Brahma dispelled Indra's doubts and said, "While being associated with the body, the Soul experiences pleasure and pain but when the Soul is no longer associated with the body, it goes beyond pleasure and pain. The Soul/Self remains unchanged and becomes free from the cycle of birth and death. The self realizes that it has always existed and is immortal.

Prajapati said to Indra, "Have you seen the sky? The sky has no form but this sky takes lightning, clouds, and various forms for some time, and then these forms dissolve, but the sky remains unchanged. Similar to the clouds, this body also takes birth and dies, but like the sky, the soul remains unchangeable. For some time, it seems that the truth is hidden in a golden world, as if a vessel of gold has covered its face but the soul, fading the lustre of gold, is illuminated by itself.

When the soul realizes its true nature, it becomes self-illuminated. This is the ultimate light. Having realized its true nature, there is no limit to the joy of the Soul/Self. Brahma further said, "Have you ever seen a water buffalo tied to a cart? In the same way, the soul is also attached to the body. But the water buffalo is not tied to the cart all the time. Sometimes it goes for bathing in a river or a pond, and sometimes goes for grazing in the fields. In the same way the self also roams freely after detaching itself from the body.

Brahma further said, "Indra, our eyes are just a tool for seeing the scenery. But actually, the Soul/Self sees everything. Similarly, the rest of our senses are also instruments for the consumption of various things like form, colour, smell, touch, etc., but in reality, these are consumed by Self alone. Therefore, the self is complete.

After attaining enlightenment, Indra thanked Brahma and returned to his palace. Indra revealed the secret of Soul to the other devas. With the knowledge of the self, all the desires of the devas were fulfilled, and they became the rulers of all the worlds. Whoever has a precise understanding of the nature of the self, can fulfil all desires and attain higher spiritual realms.

ASHRAM PUBLICATIONS

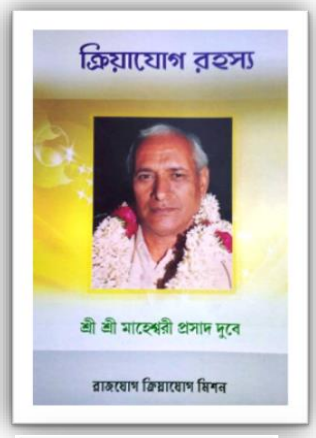
ক্রিয়াযোগ রহস্য
শ্রী শ্রী মাহেশ্বরী প্রসাদ দুবে
রাজযোগ ক্রিয়াযোগ মিশন

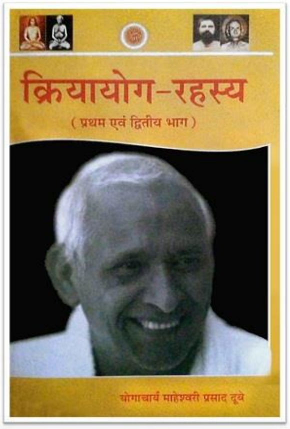
क्रियायोग-रहस्य
(प्रथम एवं द्वितीय भाग)
योगाचार्य माहेश्वरी प्रसाद दूबे

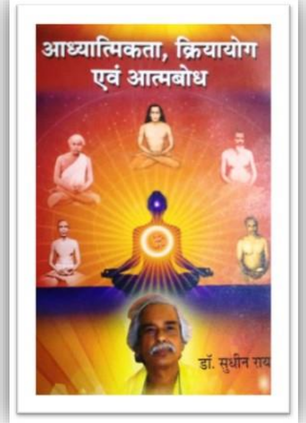
आध्यात्मिकता, क्रियायोग एवं आत्मबोध
डॉ. सुधीन राय

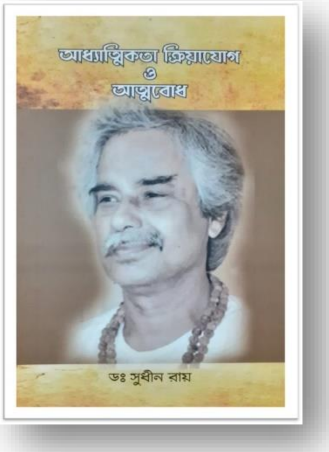
আধ্যাত্মিকতা ক্রিয়াযোগ ও আত্মবোধ
ডঃ সুধীন রায়

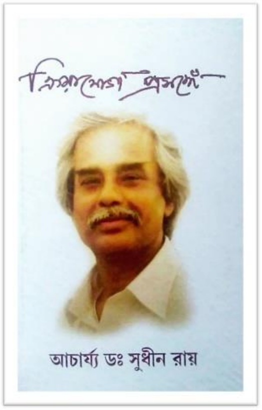
ক্রিয়াযোগ প্রসঙ্গে
আচার্য্য ডঃ সুধীন রায়

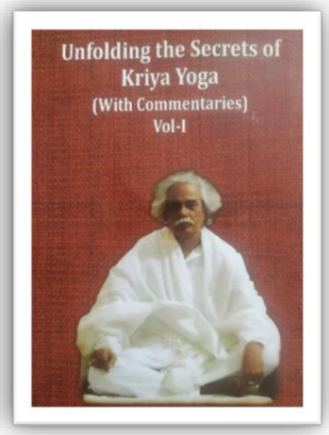
Unfolding the Secrets of Kriya Yoga
(With Commentaries)
Vol-I

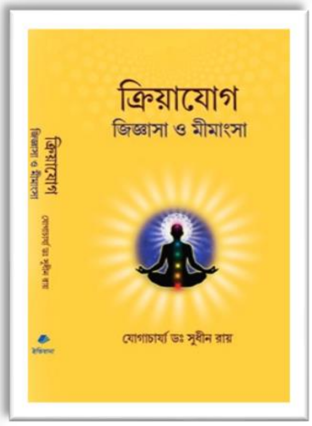
ক্রিয়াযোগ
জিজ্ঞাসা ও মীমাংসা
যোগাচার্য ডঃ সুধীন রায়

Order Ashram books and publications from our Website
www.rykym.org

ABOUT "ANWESHAN"

Anweshan is the editorial mouthpiece of RYKYM. This magazine is being published for readers interested in Kriya Yoga and spirituality. Please send your suggestions/ feedbacks on articles published in the magazine at info@rykym.org

TO KNOW MORE ABOUT KRIYA YOGA KINDLY SCAN THIS CODE FROM YOUR MOBILE DEVICE

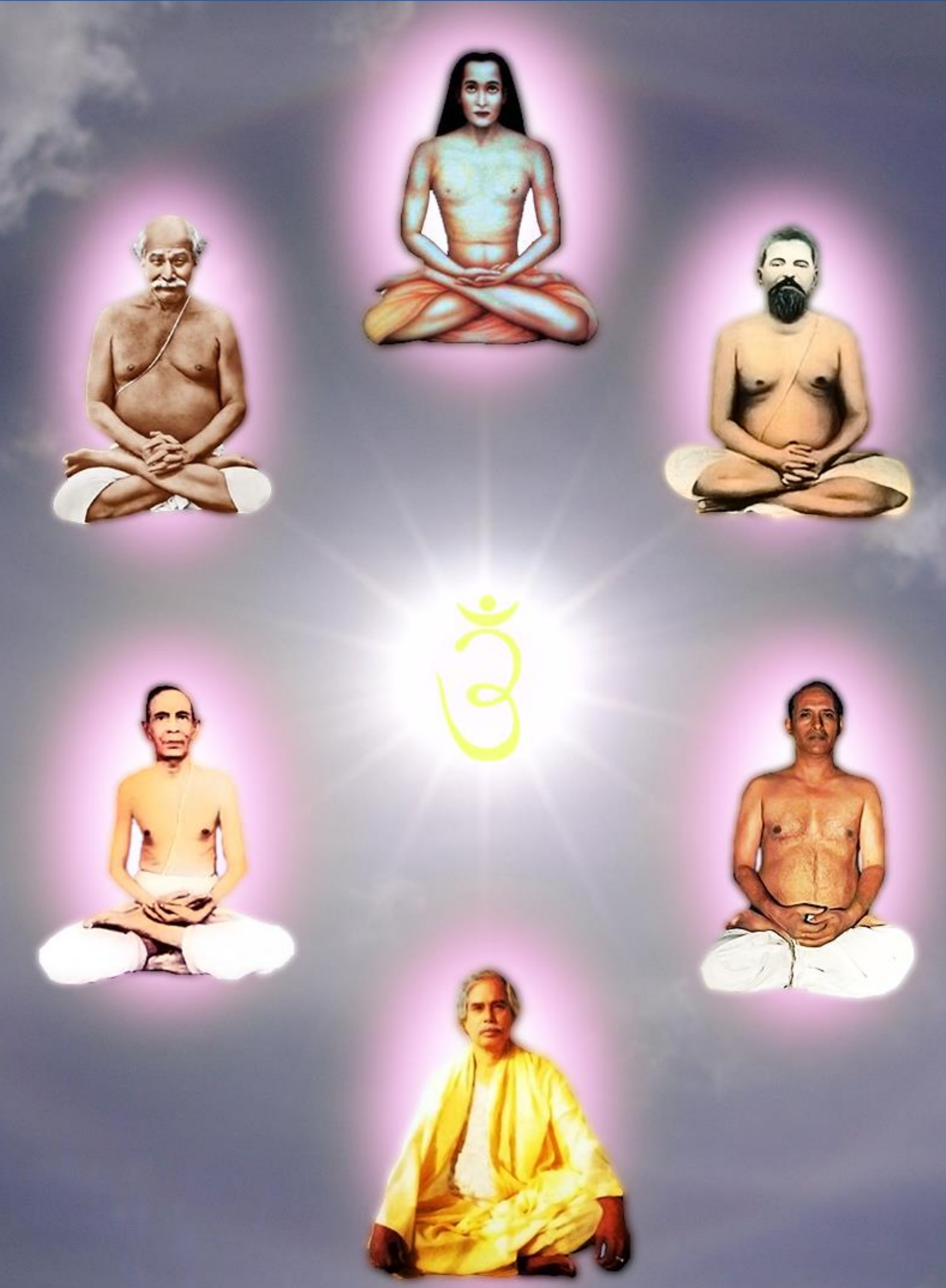

© RAJ YOGA KRIYA YOGA MISSION